ডুয়ার্সবাসীর প্রত্যাশা বাড়ল

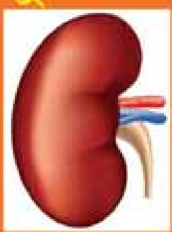

মমতাকে এবার বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে হবে

আগামীর উত্তরে বিজেপি!

মহাপরাজয় মিডিয়ার

কিডনি মাফিয়াদের ফের দৌরাত্ম্য বাড়ছে

এখন ডুয়ার্স

১ জুন ২০১৬। ১২ টাকা

মিহির গোস্বামী

সৌরভ চক্রবর্তী

অশোক ভট্টাচার্য

মিতালি রায়

বিশ্বনাথ চৌধুরী

কানাইয়ালাল আগরওয়াল

নীহার রঞ্জন ঘোষ

উত্তরের আওয়াজ পৌঁছে দিতে এবারের বিধানসভায় আরও কয়েক উজ্জ্বল মুখ

facebook.com/ekhondooars ফেসবুকে যোগ দিন ও বন্ধুদের invite করুন

ছন্দে ডুয়ার্স

ডুয়ার্স জুড়েও উড়ল আবীর টাটকা সবুজ
প্রত্যাশারাও রঙ মেখেছে এবার না-বুঝ
সবুজ নিল সবুজ মেখে নিজের হাতে
শান্তি আসুক শান্ত মেয়ের দুয়ারটাতে!

অন্য গানে সুর মেলালো চায়ের মুলুক
বন্ধ বাগান সবগুলো আজ সত্যি খুলুক
ধুঁকতে থাকা ফাক্টরীতে বাজুক বাঁশি
রুগ্ন মুখে আবার ফুটুক অমল হাসি!

বন- বাগিচা-পাহাড়-ঝোরা-নদীর টানে
আসুক মানুষ সত্যিকারের পর্যটনে
নিসর্গকে হত্যা করে নয় ইমারৎ
হয় না যেন কলুষভরা বিলাস-আড়ত!

বন নিধনের লাগামছাড়া ভীষণ ত্রাসে
রেললাইনে টুকরো হওয়া হাতির লাশে
খাদ্যবিহীন বনের পশুর হঠাৎ হানায়
আর যেন না আমরা থাকি এই ঠিকানায়!

শিল্প কোথায়? ভিনদেশে যায় গরীব ছেলে
এবার যেন এই মাটিতেই কাজটি মেলে
চাকরি যারা চাইছে আসল ডিগ্রি হাতেই
ঘুষ দিয়ে নয়, হয় যেন তা যোগ্যতাতেই।

রেল যোগাযোগ রাস্তাঘাটের হালটি ফিরুক
সার্কিট বেঞ্চ, এইমস্ শাখার শিকেও ছিঁড়ুক
টুকরো হবার অশান্তি কেউ চাই না জেনো
নতুন কোন সম্ভাবনার বার্তা এনো।

ছন্দে ঃ অমিত কুমার দে

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী ডুয়ার্স পরিচালনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১ জুন ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৪

ডাকে ডুয়ার্স
মিডিয়ার মহাপরাজয় ৫

নির্বাচনের ডুয়ার্স
আদা ও কাঁচকলার রেসিপি নয়া রন্ধনশৈলীতেও জমল না ৮
আগামীর উত্তরে পদ্মফুল! ১২
বেড়ালের গলায় এবার ঘণ্টা বাঁধবেন মমতা? ১৪

দূরবিন
রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হল ডুয়ার্সের তিন চরিত্র ১০

প্রতিবেশীর ডুয়ার্স
কিডনি মাফিয়াদের ফের হানা বিন্দোলে ১৮
যে পথে ৪৫ জোড়া মেল ট্রেন চলে, একটিও থামে না ২০
ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরের অভাব আজও উত্তর মালদায় ২১
প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ হল দক্ষিণ দিনাজপুরে ২১

পর্যটনের ডুয়ার্স
বক্সা হোম স্টে ৩৪

নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ১৭
খুচরো ডুয়ার্স ২২
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ২৪
বইপত্রের ডুয়ার্স ৩০
খেলাধুলায় ডুয়ার্স ৩৬
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ৩৭
বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স ৪২

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
তরাই উৎরাই ২৬
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৮
লাল চন্দন নীল ছবি ৩১

শ্রীমতী ডুয়ার্স
এবারের শ্রীমতী ৩৮
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৩৯
ডুয়ার্সের ডিশ ৪০
শখের বাগান ৪০

ডুয়ার্সের কফি হাউস এখন জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?
বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি
facebook.com/aaddaghar

আমরা ছিলাম, আমরা আছি

হে পুরবাসী,

তো ভোটযুদ্ধ পেরলো। ফলাফল প্রকাশের পর খুশি বাংলাবাসী। এরকম বৃহত্তর আসনে জয়ের পিছনে জনতার আদালতেরই শেষ রায় থাকে। প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহে পথচারী জলশহর বাসীদের হাতে উঠে এসেছে ছাতা। আর জলপাইগুড়ি পুরবাসী তথা সকল বাংলাবাসীরই জীবনে আসতে চলেছে আরও ভাল দিন। বর্ষাও আসতে চলেছে শীঘ্রই। ভেজা পিচরাস্তা দিয়ে জল ছিটিয়ে হুস করে বেড়িয়ে যাবে ডুয়ার্স পর্যটক। আর এসব কিছুর আগে থেকেই কিন্তু পুরসভার সকল কর্মীরা নেমে পড়েছেন মাঠে, মানে সাফাই কর্মীরা নেমে পড়েছেন রাস্তায়। পানীয় জলের যোগান অব্যহত করার জন্য লেগে পড়েছেন আরও কর্মী। জঞ্জাল তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য চালু হয়ে গিয়েছে গাড়িগুলির ইঞ্জিন।

মা-মাটি-মানুষ সরকার মানুষের সরকার। মানুষের উন্নয়নে, উন্নত পরিষেবা বিষয়ে সর্বদা খেয়াল রাখে জলপাইগুড়ি পুরসভা। আমরা আরও আলো আরও পরিচ্ছন্নতা আরও প্রাথমিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও আপোষে রাজি নই। মানুষের মনের ভাষা পড়তে পারাটা মা-মাটি-মানুষের দলের ধর্ম। আমাদের হাতে ১৩০ বছরের পুরনো পুরসভার দায়িত্ব তুলে দিয়ে পুরবাসী যে ভুল করেননি তা খোলা মনে শহরের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। কিছুদিন আগেও 'করলা' নদী পরিণত হয়েছিল একটি নর্দমায়। এখন কিন্তু তার সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনের পাশে করলার দুধারে যে অপূর্ব সৌন্দর্য্যায়নের হাতছানি লক্ষ্য করা যায় তা কোনও স্বপ্ন নয়, বরং উন্নয়নের দিকে আমাদের আরও একধাপ অগ্রগতির প্রচেষ্টা। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন নাট্যদল, লিটিল ম্যাগাজিন ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মিলন উৎসবের পশ্চাতে পুরকর্মযজ্ঞে নিমগ্ন জলপাইগুড়ি পুরসভার নীরব সমর্থন রয়েছে সর্বদা। আর এর পেছনে রয়েছে আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা, ভালবাসা।

গ্রীষ্মে ও বর্ষার মিশেল আনন্দ অনুভবে আনন্দনগর হয়ে উঠুক জলপাইগুড়ি শহর। আমরা আছি সেই আনন্দের পেছনে, সব সময় চলার পথে।

পরিশেষে বলি,

'মানুষের জোটে মানুষ দিয়েছে রায়
বাতাসের জোট বাতাসেই মিশে যায়।'

শুভেচ্ছা সহ

শ্রীমতি পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

প্রত্যাশা বাড়িয়েছেন, উন্নয়ন ছাড়া গতি নেই

চা-বলয়ের আদিবাসী নেতা শুক্রা মুণ্ডা আর প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক বুলুচিক বড়াইককে ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে আদিবাসী সংগঠনের গোষ্ঠী বিবাদকে সুকৌশলে ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। ঠিক গত বিধানসভা ভোটের পর যখন থেকে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ভাঙন তরান্বিত হচ্ছিল, তৃণমূল সুপ্রিমো কাছে টেনে নেন পরিষদের মূল গোষ্ঠীকে। গড়ে তোলেন ট্রাইবাল অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল। এর মাথায় বসিয়ে দেন বীরসা তির্কেকে। কংগ্রেসের চা শ্রমিক নেতা মোহন শর্মা সহ বেশ কিছু নেতাকেও টেনে নেন তৃণমূলে। সাংগঠনিক এ ধরনের কৌশলের পাশাপাশি বন্ধ ও অচল চা-বাগানে অর্ধাহার, অনাহার, মৃত্যুমিছিলের সময় সরকারি প্রকল্পে একশো কোটি টাকার প্যাকেজ, দু'টাকা কেজি দরের চাল-ডাল সরবরাহ, আদিবাসী ছেলেমেয়েদের সাইকেল বিলি মুখ্যমন্ত্রীরই সুচিন্তিত পরিকল্পনা। বন্ধ ও অচল চা-বাগানে অর্ধাহারে থাকা শ্রমিক মহলে যে এর প্রভাব ছিল তা মানতে হবে। দীর্ঘকালের খাসতালুক বলে পরিচিতি চা-বলয় থেকে বামেরা ঝাড়ে বংশে উৎখাত হয়ে গেল।

তবে ডুয়ার্স এলাকার পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি তৃণমূলের ঝুলিতে এলেও বিজেপি কিন্তু একটি আসন কেড়ে নিয়েছে। বন্ধ রেডব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রপুর, ধরনীপুর চা-বাগানের অধিকাংশ বুথে ঘাসফুল ফুটলেও ভোট পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য এক চিত্র সামনে আনে। কিলকোট চা-বাগানের ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫ নম্বর বুথে তৃণমূলের থেকে বেশি ভোট দখল করেছে বিজেপি। ক্যারন চা-বাগানে ১৩৮ নং বুথেও লিড দেয় তারা। ডুয়ার্সের পূর্বপ্রান্ত কুমার গ্রাম থেকে পশ্চিমের মালবাজার এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ১৫০টির বেশি চা-বাগান। কুমারগ্রাম কেন্দ্রে বামেদের শক্ত ঘাঁটিতে তৃণমূল জয়ী। তবে এখানেও বিজেপির প্রাপ্য ভোট ৪৫,১৩৭ গত লোকসভার থেকেও বেশি। প্রায় একই চিত্র কালচিনি কেন্দ্রেও। হাজারো বিতর্কে জড়িয়েও এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তৃতীয়বার জয়ী হয়েছেন ঠিকই কিন্তু বিজেপি প্রার্থী হেরেছেন মাত্র হাজার দেড়েক ভোটে। সবুজ আবিরে ঢেকে যাওয়া ডুয়ার্সের আকাশে সামান্য হলেও বিজেপি যে ফায়দা লুটেছে তা নিশ্চয়ই বলা যাবে। অন্যদিকে, পশ্চিম ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ও মালবাজারে প্রভাব ফেলেছে বিজেপি। নাগরাকাটা জয়ী তৃণমূল প্রার্থীর চেয়ে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছে মাত্র ১০ হাজার কম ভোট। মালবাজার কেন্দ্রেও বিজেপি স্মরণাতীতকালে এত ভোট পায়নি। গতবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্য ভোটের থেকে এবার তিন হাজারের বেশি পেয়েছে।

বস্তুতপক্ষে এই ছবিটা তো স্পষ্ট যে চা-বলয়ে সিপিএম তথা বামেরা ধুয়ে মুছে সাফ হলেও বিজেপির ফল কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভাল। শাসক দলের সুপ্রিমো কীভাবে দেখছেন এই পরিসংখ্যান? সারদা, নারদা, সিন্ডিকেট তোলাবাজি অর্থাৎ অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি ডুয়ার্সের ক্ষেত্রে বিরোধীদের বড় ইস্যু ছিল না ঠিকই। তবে শাসক দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা গোষ্ঠীবিবাদ যে নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছে তা ডুয়ার্সের জয়ী প্রার্থীদের বক্তব্যে স্পষ্ট। শাসক দলের এই ফাটল মেরামত করতে হবে প্রধান নেত্রীকেই। এবং তা কঠোর হাতেই। বন্ধ বা অচল চা-বাগানের দুর্গত শ্রমিকদের জন্য ত্রাণ বা বিশেষ প্যাকেজ সাধু উদ্যোগ। তবে তা দিয়ে যে সমস্যা মেটে না তা মুখ্যমন্ত্রীকেই বুঝতে হবে। মূল সমস্যা সমাধানের পথেই হাঁটত হবে তাঁকে। গত পাঁচ বছরে রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ সহ উন্নয়নমূলক কাজ বহু হয়েছে। কিন্তু তা শুধু উপর উপর প্রলেপ বা নীল-সাদা রং করা পর্যায়েই যেন ঠেকে না থাকে। কারণ, পরিবর্তনের পর এই মহা পরিবর্তন মানে আস্থা দিদির উপরই। ডুয়ার্সবাসীর প্রত্যাশা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন বহু পরিমাণে। বঞ্চনার ডুয়ার্সে উন্নয়নই শেষ কথা। ডুয়ার্সবাসীর অন্তরে বাহিরে একটাই দাবি— উন্নয়ন। তাই মমতার ছোঁয়া ডুয়ার্সের উপর থেকে সরে গেলে বিপদ ডুয়ার্সবাসীর এবং দিদির, উভয়েরই।

মিডিয়ার মহাপরাজয়

> নির্বাচনের ফল বেরলে যখন দেখা যায় সেই মিডিয়ার সৃষ্ট ভবিষ্যৎবাণীগুলি আদ্যোপান্ত ফ্লপ তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নচিহ্ন জাগে মিডিয়ার ভূমিকায় এবং গুণমানে। প্রশ্নচিহ্ন আরও বড় হয়— মানুষ থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন হলে মিডিয়ার হাল এমন হয়?

জ্যোতিবাবুর আমলে এমনটাই হত। ভোটের কয়েক মাস আগে কংগ্রেসী নেতারা দিল্লির পারমিট হাতে নিয়ে ময়দানে নেমে পড়তেন। তার সঙ্গে বাজারে নেমে পড়ত বহুল প্রচারিত দৈনিকগুলি। ভোট যত এগিয়ে আসত কাগজের সংবাদ পরিবেশন ভবিষ্যৎবাণীর পর্যায়ে পৌঁছে যেত। বাংলার বাবু সম্প্রদায় নড়েচড়ে বসতেন, যাক অত্যাচারীর বজ্রমুষ্ঠি থেকে এবার হয়ত রেহাই পাচ্ছে বাংলা। কিন্তু নির্বাচন শেষে ফল বের হলে দেখা যেত কংগ্রেসের আসন দুই অংক কখনই পেরোতে পারেনি, বঙ্গেশ্বর স্বমহিমায় পুনর্বহাল। এমনই করেই কেটে গিয়েছে সাত সাতটি বিধানসভা নির্বাচন— কিশোর পৌঁছে গিয়েছে শেষ যৌবনে আর যুবক বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়েছে। কিচ্ছুটি পালটায়নি।

এবার বিধানসভা নির্বাচনেও তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে মাত্র, অন্য কোনও ম্যাজিক ঘটেনি। তফাৎ কেবল, বিরোধীরা সেই সময়ের মতো রিগিং-এর ধুয়ো তুলতে পারেনি, বিস্মিত চোখে মেনে নিতে হয়েছে পরাজয়কে। আর তফাৎ হল, সেদিনের তুলনায় সংবাদমাধ্যমের কলেবর ও শক্তি বেড়েছে বহুগুণে। প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে যোগ হয়েছে জনপ্রিয় টিভি মিডিয়া এবং আধুনিক ডিজিটাল মিডিয়ার। যাদের সমবেত ক্রমাগত প্রচারে (অস্বীকার করার উপায় নেই) শাসকদলের বহু নেতা-কর্মীরও মনে জমে উঠেছিল আশংকার কালো মেঘ। অন্যদিকে আবার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার বাসনায় বুঁদ হয়ে কেবল মন্ত্রীত্বের ভাগাভাগিই নয়, পুরনো কমরেডদের খুঁজে খুঁজে গর্ত থেকে বের করার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন বামপন্থী নেতা-কর্মী-শিক্ষক-চিকিৎসক, সরকারি কর্মচারী এবং বিদ্বজ্জনেরাও। তাঁদের যুক্তি ছিল অতি সরল— যদি হঠাৎ করেই গদি উলটে যায় তখন নিজেদের প্রস্তুতি না থাকলে বিপদে পড়তে হবে। আর এই সব কিছুর সৌজন্যে ছিল একটাই নাম, এ রাজ্যের মিডিয়া বা গণমাধ্যম। আজ তাই নির্বাচনের ফল বেরলে যখন দেখা যায় সেই মিডিয়ার সৃষ্ট ভবিষ্যৎবাণীগুলি আদ্যোপান্ত ফ্লপ তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নচিহ্ন জাগে মিডিয়ার ভূমিকায় এবং গুণমানে। প্রশ্নচিহ্ন আরও বড় হয়— মানুষ থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন হলে মিডিয়ার হাল এমন হয়? নিউজ ডেস্কে বসে মোটা চশমার গালে

মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে এতটা বালখিল্যতায় সাংবাদিকদের তবে কোনও ভূমিকাই কি নেই? তারা কি কেবলই মালিকপক্ষের আজ্ঞাবহ দাস? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে, আজকের সাংবাদিক আর লেখাপড়ার ধারকাছ দিয়ে যায় না। হাতের মোবাইল ফোনের গুগলে নির্ভর সে সাংবাদিকের রাজনৈতিক ইতিহাস সীমিত, সাংবাদিকতার ধারাবিবর্তন তার অজানা, এই মহান পেশার কোনটা করা উচিত বা উচিত নয়, সে নিয়ে তার পাঠ শূন্য।

সযত্নে ছাঁটা দাড়ি নিয়ে যে 'অভিজ্ঞ' সাংবাদিক উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত কোনও এলাকার ভোট কভার করছেন তিনি সেই সব এলাকায় আদতেই কোনওদিন গিয়েছেন কিনা সন্দেহ থেকেই যায়। প্রেসক্লাবের এসি হলে বসে যে 'প্রাজ্ঞ' কলামনিস্ট জুনিয়ারদের ভোটের পাটিগণিত নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন তিনি সকালে উঠেই ভুলে যান রাতে কী বলেছিলেন। আরও মজার ব্যাপার হল, নিউজ চ্যানেলের যে জনপ্রিয় ডালিম কুমারটি হাসিকান্নার ফুটেজ ও পাল্টা তর্ক-বিতর্কের নাটকীয়তায় রোজ সন্ধেয় মধ্যবিত্তের ড্রইংরুম গরম করে রাখেন তিনি কাজের চাপে (ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বা আফ্রিকান সাফারিতে যাওয়া সম্ভব হলেও) বাংলার গ্রামেগঞ্জে শেষ কবে গিয়েছেন বলতেই পারবেন না। মুটে-মজুর-চাষা-কুলিদের দুনিয়া থেকে বহু দূরে থাকা এইসব ভিনগ্রহের বাসিন্দারা যদি আড়াল থেকে কারও নির্দেশে হঠাৎ নিজেরাও ভাবতে শুরু করেন মানুষের ভোটে নির্বাচিত আস্ত একটি সরকারকে সত্যি সত্যিই বেমালুম গদিচ্যুত করে দিতে পারেন চাইলেই, তবে প্রশ্ন ওঠে একটাই— মিডিয়া বা সাংবাদিকতাকে 'চটুল' পর্যায়ে নিয়ে আসার অধিকার এদের কারা দিয়েছে?

সাংবাদিকতার এক প্রবীণ অধ্যাপক বছর কয়েক আগের একটি সেমিনারে সহজ ভাষায় আক্ষেপ করেছিলেন, গণতন্ত্রের 'চৌকিদারি' করা যাদের ধর্ম তারা যদি হঠাৎ 'দাদাগিরি'-কে নিজেদের কর্ম বলে মানতে শুরু করে তবে সাংবাদিকতার যা দফারফা হওয়ার তা চালু হয়ে গিয়েছে। ওবি ভ্যানের কুঠুরি থেকে চ্যানেল লোগো শোভিত চোঙা নিয়ে বীরদর্পে ময়দানে নামার মধ্যে যে 'দম্ভ' ফুটে বেরোয়, তার মধ্যে রোমান্টিকতা আছে ঠিকই, সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধামিশ্রিত আকর্ষণও অনুভব করে, কিন্তু যতই ক্যামেরা এগিয়ে আসে জনমত তত দূরে সরে সরে যায়। যুদ্ধ বা বিপর্যয়পীড়িত মানুষের বেদনাকে হয়ত সরাসরি পৃথিবীর নানা কোণে পৌঁছে দেওয়া যায়, কিন্তু রাজনীতি-পীড়িত মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছনো সম্ভব হয় না। কারণ রাজনীতিতে সবটাই চলে চোখের আড়ালে।

সেদিন সেই প্রবীণ সাংবাদিকের বক্তব্য শোনার জন্য হাজির ছিলেন না এই প্রজন্মের কোনও রিপোর্টার। তবু তিনি বলে চলেছিলেন, আমাদেরও সওদাগরি ফার্মের চাকুরিজীবির মতোই মালিকশ্রেণির ইচ্ছেমতন চলতে হয়। খুব সত্যি কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্যি কাগজ বা চ্যানেলের বিক্রি বাড়াতে গিয়ে যেটা সবার আগে মাথায় রাখতে হয়, তা হল সাধারণ পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা। এই বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে যে কোনও ব্র্যান্ড। আমরা জানি, শাসক-বিরোধিতায় 'কঠোরতা' না দেখালে 'বাবু' সম্প্রদায়ের মন পাওয়া যায় না, কারণ তেনারাই আসল ক্রেতা। কিন্তু এই 'কঠোরতা' লাগাতার জারি রাখলে এই বিশ্বাসযোগ্যতায় এক সময় আঘাত লাগেই— একঘেয়েমিতে ক্লান্ত পাঠক মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তখনই সন্দেহ জাগে সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে। মাসের পর মাস ধরে চলতে চলতে যে সরকার-বিরোধিতা তুঙ্গে উঠেছিল, ভোটের পরে তা যে বেলুনের মতোই চুপসে যেতে পারে একদিন, সে সব মাথায় রাখেনি কোনও সাংবাদিক। মানুষের আশা-প্রত্যাশা থেকে ক্রমাগত বহুদূরে থাকলে তার পাঠকও যে একদিন মুখ ফিরিয়ে নিতে দ্বিধা করে না, তা বলাই বাহুল্য।

আবার প্রশ্ন জাগে— মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে এতটা বালখিল্যতায় সাংবাদিকদের তবে কোনও ভূমিকাই কি নেই? তারা কি কেবলই মালিকপক্ষের আজ্ঞাবহ দাস? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে, আজকের সাংবাদিক আর লেখাপড়ার ধারকাছ দিয়ে যায় না। হাতের মোবাইল ফোনের গুগল-নির্ভর সে সাংবাদিকের রাজনৈতিক ইতিহাস সীমিত, সাংবাদিকতার ধারাবিবর্তন তার অজানা, এই মহান পেশায় কোনটা করা উচিত বা উচিত নয়, সে নিয়ে তার পাঠ শূন্য। স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ পাঠকের নার্ভ বুঝে তাকে পথ দেখানোর বদলে তাকে 'বিভ্রান্ত' করে তোলে আজকের চনমনে সাংবাদিক। তার ধারণা হয়, পাঠক যেহেতু সংবাদমাধ্যমকে অন্ধের মতো মেনে চলে অতএব পাঠককে যা খুশি গিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অতএব শুরু হয়ে গেল 'মশলা' রিপোর্টিং বা খবর 'ম্যানুফ্যাকচারিং'। নেতা বা সেলিব্রিটির একটুকরো বক্তব্য নিয়ে বিচিত্র ভাবসম্প্রসারণ এবং তার পালটা মন্তব্যে জমে ওঠে আসর। 'পাবলিক হেভি খাচ্ছে' বাক্যবন্ধের সৃষ্টি হল তখন থেকেই। এককালের দুঁদে সাংবাদিকরা পরলোকে চলে গিয়েও বোধহয় আঁতকে উঠলেন, এখানেই পথভ্রষ্ট হল মিডিয়া। অন্তঃসারশূন্য নয়া প্রজন্মের সাংবাদিককুল এবার নিজেদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবনা চাপিয়ে দিতে শুরু করল সাধারণ পাঠক-দর্শকের ওপর। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠলেন না মুষ্টিমেয় কিছু 'সেকেলে' সাংবাদিক, পেছনের সারিতে প্রায় অন্ধকারে চলে গেলেন তারা।

কিন্তু সবজান্তা এই প্রজন্ম যে ভুলটা একই সঙ্গে করতে শুরু করল তা হল মানুষের মতামত বা ফিডব্যাক নেওয়াটা ক্রমে ক্রমে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। নিজেদের অজান্তে একদিন মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীরা। রোমান্টিকতায় ভরা পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যম থেকে অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা হারিয়ে গেল। গ্রামীণ সংবাদদাতারাও বেশিরভাগই স্থানীয় নেতার মনোরঞ্জনে ব্যস্ত, অতএব প্রখর রৌদ্র বা অবিরাম বৃষ্টিতে শহুরে সাংবাদিকদের প্রত্যন্ত পাড়া গাঁয়ে পাঠাবার চাইতে অনেক বেশি ঝঞ্ঝাটহীন উপায় হল সমীক্ষার আশ্রয় নেওয়া। এর ফল যা হওয়ার তা এবারই আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে— বিরোধীদের আগেই ধরাশায়ী হয়েছে রাজ্যের সর্ববৃহৎ সংবাদ প্রতিষ্ঠান। যদিও তাদের হাবভাব এখনও এমন যেন 'কুছ পরোয়া নেহি, সব ঠিক হো যায়গা'। কারণ মানুষ আজ সবকিছু দ্রুত ভুলে যেতে পারে। একটা বিস্ফোরণ বা ধর্ষণ কিংবা খুন অথবা মুখ্যমন্ত্রীর একটি বেফাঁস বিবৃতি নিজেদের ত্রুটি ঢেকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু চাকরি করে খাওয়া এই অতিবুদ্ধিমান প্রজাতির অজান্তে অলক্ষ্যে সাধারণ পাঠক সম্বন্ধে যে বাক্যবন্ধটি ক্রমাগত জনপ্রিয় হচ্ছে, খুব শীগগিরই চাউর হয়ে পড়ল বলে, পাড়ার ঠেকে, পান দোকানে, বাজারে বা আপিসে কারও কোনও অবান্তর কথা শুনলেই মন্তব্য উড়ে আসছে— পাগল? নাকি মিডিয়া?

উত্তরায়ণ সমাজদার

মাথাভাঙ্গা পৌরসভা

উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন মানুষ তাঁদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা

উন্নয়নের পক্ষেই রায় দিয়েছেন মানুষ। এই জয় কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নয়। এই জয় নিরন্তর এলাকাবাসীর সেবায় অঙ্গীকারের। আমাদের প্রেরণা মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই আমাদের পথ দেখিয়েছেন। সেই পথেই এসেছে সাফল্য। এই জয় তাই একটি দলের নয় একটি মতবাদের। সেই মতবাদ মা-মাটি-মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের।

মানুষ আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। আমরা তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব। সর্বব্যাপি উন্নয়নের মাধ্যমে সুস্থ সবল পুর এলাকা গড়ে তোলাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই কাজ আমরা অনেক আগেই শুরু করেছিলাম। এলাকাবাসী ওই কাজ সর্বাত্মক সফল করতে যেভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, সেই সহায়ক ভূমিকাই আমাদের আগামী দিনের পাথেয়। আজকের মতো আগামী দিনেও যেন আপনাদের আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত না হই।

সর্বব্যাপি উন্নয়নের মাধ্যমে স্বপ্ন সত্যি করাই এখন থেকে আমাদের একমাত্র ব্রত। এলাকাবাসীর আশীর্বাদ, দোয়া আমরা বিনম্র চিত্তে স্বীকার করছি। অকুণ্ঠ কৃর্তজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁদের প্রতি।

শুভেচ্ছা সহ

লক্ষপতি প্রামাণিক, চেয়ারম্যান

চন্দন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান

আদা ও কাঁচকলার রেসিপি নয়া রন্ধনশৈলীতেও জমল না

গোড়ার গলদ

জোটের হাওয়া যখন মিডিয়ার একাংশের প্ররোচনায় পা দিয়ে ডুয়ার্সে 'উঠতে' শুরু করেছে তখন থেকেই দেবপ্রসাদ রায় ওরফে মিঠুদা'র জোট বিরোধী কথা ছাপতে শুরু করেছিল কয়েকটি সংবাদপত্র। খুব কৌশলে, দেবপ্রসাদবাবু যা বলেন নি, তা তাঁর মুখে বসিয়ে দেওয়ার নমুনা চোখে পড়ার পর কলকাতার এক প্রখ্যাত সংবাদপত্রের সাংবাদিককে তিনি ফোনে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, এসব 'আপন মনের মাধুরী মেশানো' লেখা না লিখতে। সাংবাদিকতায় 'এথিকস' বলে একটা শব্দ আছে। বাংলা সাহিত্যের এক প্রখ্যাত লেখকের পুত্র সেই সাংবাদিক অবশ্য পরে নিজের কথা দেবপ্রসাদবাবুর মুখে বসান নি। কিন্তু আগের সংবাদগুলো যে 'স্বকল্পিত'— তা নিয়েও কোনও দুঃখ প্রকাশ করেন নি।

মিডিয়া চাইছিল না যে জোটবিরোধী বক্তব্য লোকের সামনে আসুক। দেবপ্রসাদবাবু গোড়া থেকেই বলে আসছিলেন যে, সাধারণ মানুষ মাত্র পাঁচ বছর পরই বামপন্থী সরকার চাইছে না। জোট ক্ষমতায় এলে বামপন্থীরাই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এটা সাধারণ মানুষের 'না পছন্দ'। রাজ্য কংগ্রেসেরও উচিত নয় মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে চৌত্রিশ বছরের কাহিনি ভুলে যাওয়া। 'যে ইতিহাস ভুলে যায়, সে ইতিহাসকে পুনরাবৃত্তি হতে দেখতে বাধ্য'— এটা কংগ্রেসীদের মনে রাখা উচিত।

বলাবাহুল্য ডুয়ার্সের কংগ্রেস নেতাদের একটা ভালো অংশ গোড়ায় বামদের (পড়ুন সিপিএম-এর) সঙ্গে জোটে যাওয়া নিয়ে আপত্তি তুলে আসছিলেন। পরে উচ্চ নেতৃত্বের চাপে এবং মিডিয়ার ছলাকলায় ভুলে গিয়ে রাজি হয়ে যান। টিভির বিশেষ চ্যানেলের সামনে বসে তাঁদের মনে হতে থাকে যে, নিচুতলার কর্মীরা জোট চাইছেন। কিন্তু নিচুতলার 'ভোটার'রা কি তা চেয়েছিলেন? খবর নিলে দেখা যাবে যে বামেদের মধ্যেও জোট বিরোধিতার ক্ষোভকে একতরফা চেপে দিয়েছিল দল।

ডুয়ার্সে অর্থাৎ আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ, ছোট শহরগুলির জনতা, চা বলয়— নির্বাচনের আগে ঘুরে বেরিয়ে একবারও মনে হয় নি যে সাধারণ ভোটাররা জোট চাইছেন। তাঁরা স্বীকার করেছেন তৃণমূলের অনেক কাজ তাঁদের পছন্দ নয়, কিন্তু তাই বলে আবার 'লাল পার্টির মুখ্যমন্ত্রী?' অসম্ভব!

ভোটের আগে এইসব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের প্রতিবেদকরা 'এখন ডুয়ার্স'-এ কিছুটা পরোক্ষে জানান দিতে চেয়েছিল যে, জোট আসলে 'দিদিভাই'-এর দলকেই অক্সিজেন দিচ্ছে। ডুয়ার্সে কংগ্রেস হল ক্ষীরের মালপোয়া। সিপিএম এটা পেলেও ফাইনালি কে খাবে, তা বলা কঠিন। এসব পড়ে কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'এটা নিশ্চয়ই টিএমসি'র কাগজ!'

জোটের বিরোধিতা করলেই কি কেউ টিএমসিপি হয়ে যায়?

ফল বেরোনোর পর দেখা যাচ্ছে যে ডুয়ার্সের তিন জেলার ২১টি আসনে জোটের কপালে জুটেছে মাত্র একটি! আর রাজ্যজুড়েও যে ডানপন্থীরা আদৌ বামপন্থীদের প্রতি অনুকম্পা দেখায়নি, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।

অতএব গলদ গোড়াতেই। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ যা চায়, তাই হয়। মিডিয়া যা চায়, তা নয়। 'বাবু' নামক রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সে-ই কবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, সংবাদপত্র বেদ নয়।

ফলেন পরিচয়তে

ডুয়ার্সে কি তবে সিপিএম-এর ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল?

যদি ইতিহাসের দিকে তাকানো যায় তবে চোখে পড়ে যে ডুয়ার্সে বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার পিছনে সিপিএম-এর কোনও অবদান নেই। এই কাজটা আসলে করেছিল তাঁদের শরিকরা। সিপিএম ছলে বলে কৌশলে শরিকদের তৈরি করা জমিতে পা রেখে বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষকে রেশন কার্ড দিয়ে 'ফ্রন্টসখা'দের গৌণ করে ফেলেছিল মাত্র। বেচারা আরএসপি-ফরোয়ার্ড ব্লকের 'কমরেড'রা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে কেবল। পরের জন্মে দাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা মেনেই নিয়েছিল শেষাবধি।

সেই সিপিএম ফল বেরোবার পর নিশ্চিহ্ন। ডুয়ার্সে। বিজেপির সদ্য ফোটা পদ্ম ভোটের সরোবরে শোভা পাচ্ছে বদলে। অথচ জোটবন্ধনের পর সিপিএম-এর কর্মীদের উৎসাহ, এই ডুয়ার্সে ছিল চোখে পড়ার মতো। জোটের মিছিলে তাঁরাই আগে হাজির হয়ে আয়োজন পুরো করে ফেলতেন। দু'ঘণ্টার সভায় 'হাত' চিহ্নের দুটো বক্তা থাকলে লালদের থাকত আটটা। মিটিং শেষে চা খাওয়ানোর জন্য দরাজ হাতে এগিয়ে আসতেন তাঁরাই। কংগ্রেসের একজন তরুণ নেতা এই দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'কী কাণ্ড! আমাদের তো কিছুই করতে দিচ্ছে না।' এতসব কান্ডের পরেও দুই দলের সমর্থকেরা ইভিএম-এ নিজেদের সেন্ট পার্সেন্ট দিলেন কই?

ফলে, ফল ঘোষণা শুরু হওয়ার পর পর ঘাসফুলের উল্লাস শুরু হতেই টিভিতে মহম্মদ সেলিমকে বলতে শোনা গেল, 'কংগ্রেসীরা আমাদের ভোট দেয়নি' গোছের বক্তব্য। বিমান বসু বলে ফেললেন যে জোট তো হয়নি। বোঝাপড়া হয়েছিল। কংগ্রেসী নেতারাও টের পেতে লাগলেন যে ২০১৪-এর পাটিগণিত মেনে মানুষ জোটকে ভোট দিতে যায়নি এবং এই কান্ডটা তাঁদের সমর্থকেরাই বেশি ঘটিয়েছে। নয়ত ২০১৪-এর নিরিখে মোটে পাঁচটা আসন বাড়ল বামেদের!

না। দেয়নি। কংগ্রেসীরা আশানুরূপ ভোট দেয়নি বামপ্রার্থীদের। ডুয়ার্সেও দেয়নি। কেন দেবে? বামপন্থীদেরও সবাই

দিয়েছেন কি? দেড় শতাংশ 'নোটা' কোত্থেকে এল ইভিএম-এ? ভূতেরা কি 'নোটা' দেয়? সবাই জানে। কিন্তু সিপিএম জানে না। কারণ, তাঁরা 'শৃঙ্খলাবদ্ধ দল'। দলের সবাই নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দেবে বলে নিশ্চিত! সেই গোড়ায় গলদ। এই 'নির্দেশ' দলীয় কর্মীরা মানতে পারেন। কিন্তু ২০১৬ সালে এসে আম ভোটারের বয়ে গিয়েছে বামপন্থীদের অক্সিজেন জোগাতে। আর কংগ্রেসের সমর্থকদেরও বয়ে গিয়েছে সিপিএমকে ভোট দিতে! চল্লিশ বছর ক্ষমতায় না থেকেও যখন ভোট দিইনি, তো এবারও দেব না। তাই যতটা ভাবা হয়েছিল ততটা দেয়নি তাঁরা। খুব উচ্ছৃঙ্খল দল তো!

ফলে ক্ষীরের মালপোয়াটা ফাইনালি বামদের খাওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'জোট করাটা সিপিএম-এর ব্লান্ডার'।

বিশ্বাসঘাতকতা বামেদের প্রতি?

ফল বেরতে শুরু করার পরপরই ফেসবুকে এক অভিমানী পোস্ট পাওয়া গেল। যার মূল কথা 'কংগ্রেসীরা জোটের দাম দেয়নি।' মানে, একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেছেন পোস্টকর্তা। সত্যিই তো! দল বেঁধে ভোট দিয়ে বামেরা তাঁদের তুলনায় অর্ধেক আসনে দাঁড়ানো কংগ্রেসকে প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট জিতিয়ে দিল আর নিজেরা কি না সেই ফিফটির অর্ধেক! কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতক!

এটা অভিমানজাত অভিযোগ। আসল কথা হল, সবাই দেখছিল যে জোট বন্ধনহীন। কিন্তু কেউ বলতে পারছিল না। কারণ মিডিয়া বলছিল, 'কী অপূর্ব! কী প্রভাব! কী সাড়া!' দু-চারটে বালক শুধু বলেছিল, 'এই জোট! তোর বন্ধন কোথায়?'

গ্রহের ফেরে 'কমরেড'রা আচমকা কংগ্রেসীদের 'ভাই' বলে মহোৎসাহে এগিয়ে এলেও কংগ্রেসীরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন নি। ডুয়ার্সই বা ব্যতিক্রম হবে কেন?

'সিপিএম যদি গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চাইত তবে কংগ্রেসকে দেড়শো সিট ছেড়ে অধীরকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রোজেক্ট করত। সেটা করবে না! আসলে পাঁচ বছর ক্ষমতায় না থেকে ওদের শ্বাসকষ্ট উঠে গিয়েছে। আর আমরা তো চল্লিশ বছর ধরে পাওয়ারলেস!' জনৈক প্রবীণ কংগ্রেস সমর্থকের এই উপলব্ধির প্রতিফলন গ্রামের রাস্তাতেও শুনেছি। সেখানে আরও সরলভাবে মুচকি হেসে প্রশ্ন তুলেছে, 'জোট এলে কংগ্রেসের কী?'

কিন্তু বামপন্থীরা এই ষড়যন্ত্র ধরতেই পারেন নি। ফলে ডানপন্থী ভোটাররা ঠিকই করে নিচ্ছিলেন যে সিপিএমকে ভোট দেবেন না। কোথায় দেবেন সেটা আলাদা কথা। তাই কংগ্রেসের ভোট 'হাত', 'নোটা' আর 'ঘাসফুল' ছেড়ে 'কাস্তে-হাতুড়ি'র দিকে নিশ্চিত কম গিয়েছে। বামদের ছেড়ে যাওয়া বিজেপি ভোটাররা কেউ কেউ 'ব্যাক' করলে তাঁদের শিবির বদলে গিয়েছে।

সরল সত্যটা অবশ্য মিডিয়ার হাওয়ায় উড়েই গিয়েছিল। যারা ধরতে পারছিলেন, তাঁদের পাত্তা দেওয়া হয় নি। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন সভায় তাঁদের সদস্য তিরিশ! জোট না করলে কি এর চাইতে খারাপ হত?

শিলিগুড়ি মডেল

অশোক ভট্টাচার্য অবশ্য জিতেছেন। কিন্তু শিলিগুড়ির বাইরে তাঁর 'মডেল' ঘোরতর ফ্লপ। তিনি যখন মডেলটা প্রথম দাঁড় করালেন, তখন থেকেই আলিমুদ্দিনের উচিত ছিল সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে অশোকবাবুকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া। বস্তুত গোড়াতে অশোকবাবুর সাফল্যের সূত্রটাকে কাজে লাগানো যায় কি না, এ নিয়ে আলিমুদ্দিন আদৌ ভাবে নি। গুরুত্ব না দিতে চাওয়ার মানসিকতা থেকেই বোধহয় গোড়ায় উদাসীন ছিলেন পলিট নেতারা। অথচ পরে যখন টের পেলেন তখন জাগলেন, 'ওঠ ছুড়ি তোর লাগল বিয়ে'র কায়দায়।

শুনতে অবাক লাগতে পারে। কিন্তু ভোটের ফল ডুয়ার্সের সাধারণ কংগ্রেসীরা খুব একটা দুঃখে নেই। নেতারাও অনেকে মনে মনে বেজায় মজা পেয়েছেন। আর প্রকৃত বাম সমর্থকরা ভাবছেন, এর চাইতে আর কী খারাপ হত একা লড়লে? বিশ্বাসযোগ্যতাটুকু তো থাকত!

ডুয়ার্স কার্ল মার্ক্সের দর্শনে অবিশ্বাস করে না। বাংলাও না। কিন্তু এর ধ্বজাধারী হিসেবে সিপিএমকে মানতে নারাজ। 'মার্ক্স কি সিপিএম বানিয়েছে?' ২০০৭ সালের আগে কোনও এক সভায় এই প্রশ্নটা করেছিলেন কোনও এক বক্তা।

কমরেডরা এবার আলিমুদ্দিন উপেক্ষা করতে শিখুন। ডুয়ার্সে আপনাদের কোনও অস্তিত্ব নেই! কোনও 'বিশ্বাস' যদি না থাকে তবে 'ঘাতকতা'র দরকার হয় না। শাসক দলের প্রতি ক্ষোভ এখনও আছে ডুয়ার্সে। কিন্তু সেই ক্ষোভের জ্বালায় কংগ্রেসীরা দলবেঁধে সিপিএমকে ভোট দেবে এবং বিজেপি-র ভোটাংশ জোটের ব্যাঙ্কে ঢুকবে, এতটা অনুমান করা একটু বাড়াবাড়ি ঠেকছিল। নইলে জোটের ফল এতটা খারাপ হওয়ার কোনও কারণ নেই।

এটাই বঙ্গ নির্বাচনের সরল কাহিনি। জোট নির্মাণ অভিযান শুরু হতেই তো লেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অথচ ভোটে হাফ ডজন মন্ত্রী ঘায়েল হয়েছে। মদন মিত্র কুপোকাত। নির্বেদ রায় প্রত্যাখ্যাত। কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া কতিপয় ডাকসাইটে নেতা পরাস্ত, মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে দু'হাজার 'নোটা'।

ক্ষোভের আঁচটা ছিল। আছে। কিন্তু 'বিকল্প' না পাওয়ায় তা ভোটে রূপান্তর করলেন না রাজ্যের নির্বাচক মণ্ডল। আর এটা যারা অনুমান করেছিলেন, তারা তা ব্যক্ত করলেই কটাক্ষ করে বলা হচ্ছিল 'তৃণমূলে যাচ্ছেন বুঝি?'

অশোকবাবু বুদ্ধিমান। গল্পটা আগেই টের পেয়ে মাঠে নেমে পড়েছিলেন। তাঁর আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠিত। শিলিগুড়ির হাতপন্থীরা তাই সেখানে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেন নি।

অতএব

জোট গঠিত হলেই যে ডুয়ার্সে তৃণমূল বিরোধী ভোট এক জায়গায় পড়বে, এটা ঘটেনি, গোটা রাজ্যের অধিকাংশ আসনেই এটা ঘটেনি। অথচ এই ইঙ্গিত গোপন ছিল না। যে জলপাইগুড়ি জেলা ছিল 'লালদুর্গ', সেখানে বামেদের আসন শূন্য হল। কংগ্রেসের নেতারা মুখে বলছেন বটে যে জোট চলবে। কিন্তু চলবে না। কারণ ভবিষ্যতে বাংলার মসনদে কংগ্রেসের আসার সম্ভাবনা বামেদের চাইতে উজ্জ্বল। ভবিষ্যতে পরিকল্পিত জোট করতে চাইলে তাঁরা বামেদের কম আসন ছাড়বে। পাশাপাশি, শাসক দলের সঙ্গে জোট করে বামেদের একঘরে করে দেওয়ার সম্ভাবনাও ভবিষ্যতে প্রবল।

মালদা-মুর্শিদাবাদে কিঞ্চিৎ নমনীয়তা দেখালেও ডুয়ার্সের কংগ্রেসী ভোটাররা জোটকে যে জোর জব্দ করেছে, তা মানতেই হবে। বিজেপি ভাঙা ভোটও ফিরে আসেনি জোটের বাক্সে। ডুয়ার্সের বামেরা ধরেই নিয়েছিলেন যে শাসক দলের কুকর্মের কারণে কংগ্রেস তাঁদের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবে। আসলে এসবই ছিল জনগণ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে অংক কষে জেতার মতো রোমান্টিকতা। বাস্তবের কড়া ধাক্কায় সে খোয়াব টুটেছে।

শুধু একটাই খটকা। একটি বিশেষ সংবাদ গোষ্ঠী অকস্মাৎ গণশক্তির ভূমিকা পালনে এত উঠেপড়ে লেগেছিল কেন? দীর্ঘ সময় ধরে 'আদা' আর 'কাঁচকলা' মনোভাবের সমর্থকদের একসঙ্গে মিলিয়ে সুস্বাদু খানা রান্নার রেসিপি তাঁদের কে পাঠাল?

শ্রীজীব গোস্বামী

রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হল ডুয়ার্সের তিন চরিত্র

শেষ পর্যন্ত সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়েছে। রাজ্যব্যাপী জয়-জয়াকারের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের ফলাফলে খাঁটি গরুর দুধের মধ্যে দু'ফোঁটা চোনা পড়ার মতো ঘটনা ঘটে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার মধ্যে মালদা ও দার্জিলিং জেলায় তৃণমূলের ঘরে প্রাপ্তির সংখ্যা শূন্য। চোখ ধাঁধানো জয়ের আলোর মালায় দুটো বাল্ব যদি না জ্বলে তাতে আলোর উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় না ঠিকই তবে শূন্য স্থান দুটি কিন্তু চোখে পড়ে।

উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে, উত্তরবঙ্গ যেন দক্ষিণবঙ্গের বিপরীত দিকে চলার একটা প্রবণতা দেখায়। অনেকটা উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের পরস্পর বিপরীতমুখী চলার মতো। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে উত্তর ভারতে কংগ্রেস যখন ভোটদাতাদের কাছ থেকে শোচনীয় ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে তখন দক্ষিণ ভারতের ভোটদাতারা কংগ্রেসকে বিপুলভাবে গ্রহণ করেছে। আবার উলটো ঘটনাও দেখা গিয়েছে, দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেস যখন ব্রাত্য হয়েছে তখন উত্তর ভারতে মাটিতে পা রাখতে পেরেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু উত্তরবঙ্গে বারবার নানা কর্মসূচি নিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে দার্জিলিং ও ডুয়ার্সে তিনি যতবার এসেছেন রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী তার ধারে কাছেও আসেননি। সেই দার্জিলিং জেলায় একটি আসনও তৃণমূলের ভাঁড়ারে জমা পড়েনি। তার থেকেও বড় কথা ডুয়ার্সের চা বাগিচা অঞ্চলে যেখানে এক সময় বাম সংগঠনের একচেটিয়া আধিক্য ছিল সেখানে ঘাসফুল ফুটেছে। অন্যভাবে ঘাসফুলের রাজ্যব্যাপী বিজয়ের জোয়ারেও মালদাতে কিন্তু পদ্মফুল ফুটেছে। মনে রাখা দরকার তা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের বিধায়কের সংখ্যা গত ২০১১ সালের নির্বাচনের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এবারের নির্বাচনে যে তৃণমূলের বিজয়রথ এমনভাবে বিজয়ীর বরমাল্যে বরণীয় হবে তা মনে হয় তৃণমূলের নেতৃত্বও ধারণা করতে পারেনি। একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে তারাও কিন্তু গণনার দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এই নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের দুটি নাম বিপরীত দিক থেকে হলেও আলোচনার মঞ্চে জায়গা পায়। একজন তৃণমূলের এই বিপুল সাফল্যের অন্যতম কাণ্ডারী সৌরভ চক্রবর্তী অপর জন কংগ্রেস-সিপিএম জোট রাজনীতির বিরোধীতায় সরব হওয়া কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায়।

সৌরভ চক্রবর্তী কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল গঠিত হবার অনেক পরে। তরুণ এই যুব নেতার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, সবার সঙ্গে মেশার সহজাত উদার মানসিকতা ও সাংগঠনিক প্রতিভা শুধু তৃণমূলের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতিষ্ঠাই নয় জেলায় তৃণমূলের এক নতুন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। উত্তরবঙ্গের এই দুটি জেলাতে বিগত ২০১১ সালের নির্বাচেনও তৃণমূল খুব দুর্বল সংগঠন বলে চিহ্নিত ছিল, সেখানে তার নেতৃত্বে তৃণমূল বৃহত্তম সংগঠনে পরিণত হতে পেরেছে। চা-বাগানের সমস্যা এই অঞ্চলের মরণবাঁচন সমস্যা। জলপাইগুড়ি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের

স্বচ্ছ ইমেজ আর সাংগঠনিক ক্ষমতায় শুধু নিজের জয় নয়, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বিরোধীরা যে এবার ধুয়ে মুছে সাফ তার সিংহভাগ কৃতিত্ব সৌরভ চক্রবর্তীর। আগামী দিনে সমগ্র ডুয়ার্সবাসী তাকিয়ে আছে এই তরুণ নেতার দিকে।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রবীণ নেতার হিসেব কখনও ভুল হয় না। হয়নিও। নিষ্ঠাবান আর রাজনৈতিক দর্শনে আনুগত্য রাখেন বলেই ক্ষোভ প্রকাশ্যে উগরে দেন না। তার যুক্তির ব্যাখ্যাও রাখতে চান দলীয় সভা ডেকে। আজ কিন্তু দেবপ্রসাদ রায় জোটের বিপর্যয়ে মনে মনে হাসছেন।

চেয়ারম্যান পদে বসেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কোনও মালিক যদি বাগান বন্ধ করে চলে যান তবে ওই বাগানের শ্রমিকরা বন্ধ বাগান চালাতে শ্রমিক সমবায় গঠন গড়লে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আর্থিক সহযোগিতা দেবে। এমন একটা গঠনমূলক বৈপ্লবিক ঘোষণা সমগ্র চা-শ্রমিকদের মধ্যে তো বটেই, উত্তরবঙ্গের চা শিল্প নির্ভর জেলাগুলিতে গভীর আশার আলো জ্বালিয়েছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানকার বিধানসভার নির্বাচনে। সবার আশা সৌরভ চক্রবর্তীর মতন এমন এক স্বচ্ছ তরুণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় উপযুক্ত জায়গা পাবেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি নাম উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন। তিনি কোচবিহারের মিহির গোস্বামী। কোচবিহার (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরওয়ার্ড ব্লকের দেবাশিস বণিককে ১৮১৯৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে আবার এক দশক পরে বিধানসভায় প্রবেশ করছেন। এই মানুষটি তার সদা হাস্যময় ও সদা প্রশারিত সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও সততার স্বচ্ছ প্রতিছবি রূপে তিনি এই জেলায় পরিচিত। এই মানুষটি নানা সময়ে নানা অজ্ঞাত কারণে দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্ধে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। দলের নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে আত্মপ্রচারে বিমুখ এই কর্মীটির মুখে কোনওদিন তার জন্য ক্ষোভের বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটেনি। এমন একজন স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মিহির গোস্বামীকে শুধু কোচবিহার জেলার মানুষই নয় উত্তরবাংলার মানুষ এবারের মন্ত্রিসভায় সদস্য রূপে দেখতে সঙ্গত কারণেই আগ্রহী।

এবার মুখ ঘুরিয়ে দেখা যাক কংগ্রেসের নেতা দেবপ্রসাদ রায়কে। তাঁকে সবাই মিঠুদা বা মিঠু বলেই ডাকতে ভালবাসে। প্রগাঢ় পড়াশোনার অধিকারী দেবপ্রসাদ রায় তার পান্ডিত্যের জন্যই শুধু নয় সদা হাস্যময় ও প্রসারিত সাহায্যের হাতের জন্য সবার কাছে পরিচিত। রাজীব গান্ধির সময় তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের শীর্ষ স্থানে ছিলেন। তঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে ছিল অত্যন্ত হিংসার কারণ। তারই প্রতিফলন দেখা যায় রাজ্যসভার জন্য তিনি কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা কবাতে। কংগ্রেসের তৎকালীন শক্তিশালী রাজনৈতিক লবির আঙ্গুলিহেলনে রাজ্য কংগ্রেস থেকেই একজন ‘নির্দল প্রার্থী’ দাঁড় করিয়ে তাকে বিজয়ী করে দেবেপ্রসাদবাবুকে হারিয়ে দেওয়া হয়।

দেবপ্রসাদবাবু কিন্তু তখনও দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ প্রকাশ্যে হাজির করেননি। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কোণঠাসা এই আজন্ম নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী সম্পর্কে বাজারে যখন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তিনি অন্য অনেক কংগ্রেসীদের মতো দলত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। তখন সত্যতা যাচাই করতে এই প্রতিবেদক তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিল। দেবপ্রসাদ বাবু উত্তরে জানিয়েছিলেন, সবাই জানে আমি প্রিয়দার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলাম। সেই প্রিয়দা যখন কংগ্রেস ছেড়ে পৃথক দল গড়েছিলেন অনেকে ধরে নিয়েছিলেন আমিও প্রিয়দার সঙ্গে তার দলে যোগ দেব। সেদিনও কিন্তু আমি কংগ্রেসে ছিলাম আজও সেই কংগ্রেসেই থাকব।

এটা তো সর্বজনবিদিত এই অসামান্য বাগ্মী ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির দেবপ্রসাদ রায়কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কতখানি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসার চোখে দেখেন। তাকে যে তৃণমূলে যোগদানের বার্তা পাঠানো হয়নি এমন কথা হলফ করে দাবি করা যায় না। দেবপ্রসাদ বাবু সেই বার্তায় সাড়া দিলে তিনি যে তাকে অতি সম্মানের সঙ্গে দলে বরণ করতেন এই সত্যটি দেবপ্রসাদ বাবুর অজানা থাকার কথা নয়।

এবারই তিনি সিপিএমের সঙ্গে জোটের নীতিগত প্রশ্নে কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আওয়াজ তুলেছিলেন। সেখানেও কিন্তু দলীয় সাংগঠনিক শৃঙ্খলা

সদা হাস্যময় এই মানুষটি তাঁর সততার কারণেই জনপ্রিয়। সাহায্যের হাত তিনি বাড়িয়ে আছেন সর্বদাই। আত্মপ্রচার বিমুখ হলেও জনগনের বিপুল রায়ে আবার ফিরে এসেছেন মিহির গোস্বামী। কোচবিহার সহ ডুয়ার্সবাসীর বিশ্বাস এলাকার উন্নয়নে তিনি হাল ধরবেন শক্ত হাতেই।

রক্ষা করেই এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এমনকি কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির কাছেও একজন নীতিনিষ্ঠ কংগ্রেসী হিসাবে এই ধরনের নির্বাচনী সমঝোতা কংগ্রেসের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হতে পারে তার ব্যাখ্যা করে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। এরপর সেই স্মারকলিপির ব্যাখ্যা করতে তিনি যখন সভা ডাকলেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ কংগ্রেস নেতৃত্বই সেই সভায় কংগ্রেসী সদস্য বা সমর্থকরা যাতে না যায় তার বন্দোবস্ত করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

আজ তৃণমূলের কাছে সেই নির্বাচনী জোটের নিদারুণ পরাজয়ের পর সিপিএমের প্রকাশ কারাত গোষ্ঠী যারা এই ধরনের জোটের তীব্র বিরোধী ছিলেন তারা সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির এই নির্বাচনী রণকৌশলের বিরুদ্ধে যেমন তীব্র আক্রমণ চালাবার সুযোগ পাবেন তেমনই কংগ্রেসের মধ্যে দেবপ্রসাদবাবুর এই বক্তব্য নিয়ে আলোচনা উঠতে বাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে তুলনামূলকভাবে অন্য রাজ্যর থেকে পৃথক সেটা রাহুল গান্ধির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানকার প্রবীণ কংগ্রেসী ও সিপিএম নেতাদের অজানা থাকার কথা নয়। এই রাজ্যে বহু দল থাকলেও এই রাজ্যের রাজনীতি তো প্রথম থেকেই দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। তীব্র কংগ্রেস বিরোধীতা উলটো দিকে সিপিএম বিরোধীতা। সিপিআই-এর নেতৃত্বে অধিকাংশ প্রাজ্ঞ ও স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব থাকলেও তারা কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল শক্তি আছে এই ঘোষণা করায় বামপন্থীদের চোখে কংগ্রেসী দালাল ও দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট দল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে বামপন্থী শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। আবার সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা করতে চায় বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র সিপিএম বিরোধীতার স্লোগান তুলে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল দল গঠন করেছিলেন। তৃণমূল দলের রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক নীতি সেই প্রশ্ন না তুলে প্রকৃত সিপিএম বিরোধী দল বলে সিপিএম বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলিকে তার দিকে টেনে নিতে পেরেছেন।

এই রাজ্যে এখনও চলছে এক প্রচণ্ড সিপিএম বিরোধী জনমত। তারা যেমন সিপিএমের সঙ্গে এই সমঝোতা মেনে নিতে পারছে না, তেমনই কংগ্রেসী বিরোধীতাকে অবলম্বন করে যে সিপিএমের জন্ম সেটাও মেনে নিতে পারেনি। দেবপ্রসাদ রায় প্রকাশ কারাতরা আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে।

সৌমেন নাগ

নির্বাচনের ডুয়ার্স

আগামীর উত্তরে পদ্মফুল!

আগামী দিনে মুনাফা দেখতে হলে পদ্মফুলের চাষ করাই বিবেচ্য। কৃষিকথার আসরে এই ধরনের উপদেশ শুনে উত্তরবঙ্গের কোনও অ-কৃষক যদি তা অর্থবাহী মনে করে তবে সে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার কোনও কারণ নেই বলেই মনে হয়। কারণ সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যা চোখে পড়ল, ৫৪টি আসনের মধ্যে পাহাড়ের তিনটি আসন ও সেই সঙ্গে মাদারিহাট ও বৈষ্ণবনগরের জয় এবং কালচিনি ও চাকুলিয়াতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার তো আছেই, এছাড়া আরও ১৭টি আসনে বিরোধী ভোটে বড়সড় ভাগ বসিয়ে তৃণমূলের জয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পাটি। 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার বিগত সংখ্যাগুলিতে বারবার ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছিল, উত্তরবঙ্গে পদ্মফুল ছাপ কমার সম্ভাবনা এবার নেই, বরং বেশিই। ২৪টি কেন্দ্রে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা ২৫ হাজার থেকে ৪৫ হাজারের মধ্যে, সে কথাই আরও একবার প্রমাণ করে।

এবারের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় উত্তরের ছয় জেলায় ৫৪টি আসনের মধ্যে অভাবনীয়ভাবে ২৪টি তৃণমূল নিলেও শহরাঞ্চলে কিন্তু তৃণমূল বিরোধী ভোট পড়েছে বেশি। জলপাইগুড়িতে পৌরসভা তৃণমূলের দখলে থাকলেও এবারের ভোটে দু'হাজারের বেশি ভোট পেয়েছে জোট প্রার্থী। কোচবিহার

উত্তরে যে সব কেন্দ্রে বিজেপি শাসকবিরোধী ভোটে ভাগ বসিয়ে তৃণমূলের জয়ের পথ সুগম করেছে

কেন্দ্র	তৃণমূল	জোট	বিজেপি
মেখলিগঞ্জ	৭৪৮২৩	৬৮১০৬	২৩৩৫৫
শীতলকুচি	১০১৬৪৭	৮৬১৬৪	২৭৩৪৭
সিতাই	১০৩৪১০	৭৮১৫৯	২৭৮০৯
দিনহাটা	১০০৭৩২	৭৮৯৩৯	২৫৫৯৮
নাটাবাড়ি	৯৩২৫৭	৭৭১০০	২১৫২৪
তুফানগঞ্জ	৮৫০৩২	৬৯৭৮২	৩০০৪৮
কুমারগ্রাম	৭৭৬৬৮	৭১৫১৫	৪৫১৩৭
কালচিনি	৬২৬০১	৬০৫০০	১৪২২০
আলিপুরদুয়ার	৮৯৬১৫	৭৭৭৩৭	২০০৯৮
ফালাকাটা	৮৬৬৪৭	৬৯৮০৮	৩০৬৩৯
ধূপগুড়ি	৯০৭৮১	৭১৫১৭	৩৬১৬৭
রাজগঞ্জ	৮৯৭৮৫	৭৪১০৮	১৭৮১১
মাল	৮৪৮৭৭	৬৬৪১৫	২৯৩৮০
নাগরাকাটা	৬৭৩০৬	৫৪০৭৮	৪৭৮৩৬
গোয়ালপোখর	৬৪৮৬৯	৫৭৮২১	১৬৯৬৬
কুমারগঞ্জ	৬৪৫০১	৬১০০৫	২৯২০১

মালদা জেলায় তৃণমূলের আসন শূন্য, বিজেপির একটি আসনে জয় ছাড়াও কেন্দ্রপ্রতি ভোট গড়ে তিরিশ হাজার।

শহরে সাত হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে 'সাবোতাজ' অভিযোগ মেনে নিলেও শাসকবিরোধী হাওয়ার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ কোনও শহরেই তৃণমূল জিততে পারেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম অবশ্য আলিপুরদুয়ার, যেখানে নতুন জেলার সেন্টিমেন্ট কাজে লেগেছে, যদিও স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, পুরনো প্রার্থী নির্মল দাস থাকলে তৃণমূল প্রার্থীর নাকি জেতা মুশকিল হয়ে দাঁড়াত। শহরে শাসক বিরোধী ভোট বেশি পড়লেও বিজেপি-র ভোট তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু যে কেন্দ্রগুলিতে বিজেপি জয়ী বা দ্বিতীয় স্থানে বা যে কেন্দ্রগুলিতে বিজেপির ভোট তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার সেসবই মূলত গ্রামীণ, পঞ্চায়েত প্রধান কেন্দ্র। অর্থাৎ ডুয়ার্স-তরাই-দিনাজপুরে গ্রামের ভোটদাতারা তৃণমূলে অধিকতর আস্থা জানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিকল্প হিসেবে পদ্মফুল প্রীতিই। যেখানে তৃণমূলের জোর কম সেখানে বিজেপি-র ভোটের পরিমাণও তুলনায় বেশি সেই একই সত্য প্রমাণ করে— তৃণমূল না হলে বাম বা কং নয়, বিজেপিই হবে তাদের প্রথম পছন্দ।

ডুয়ার্সে বাম শরিকদলগুলির সাংগঠনিক বিলুপ্তি বিজেপি-র এই অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করছে। যারা তৃণমূলের দাপট সইতে না পারলেও এবার বামেদের সরিয়ে রেখেছে তারাই অদূর ভবিষ্যতে বিজেপি শিবিরে নাম লেখাবে। অপেক্ষা কেবল সাংগঠনিক উপস্থিতি ও যোগ্য নেতৃত্বের। বাংলার দক্ষিণভাগে এবার কোমর বেঁধে যে ভাবে নেমে পড়েছিলেন বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতা-নেত্রীরা, তার কিয়দংশও যদি উত্তরে থাকত তবে তাদের আসন সংখ্যা আরও দু-চারটি যে বাড়তে পারত সে ব্যাপারে একমত হবেন সবাই। আজকের রাজনীতিতে খুব একটা কেউ সুদূরপ্রসারী ভাবনাচিন্তা করেন না, ছোট বা মাঝারি নেতৃত্ব তো বটেই। তৃণমূল ফের সদর্পে ক্ষমতায় আসায় বাম-কং শিবির আবার ভাঙবে নিঃসন্দেহে। আগামী দু'বছরে বহু নেতা-কর্মী দল ভেঙে বেরিয়ে আসবেন, বেশিরভাগই যোগ দেবেন অধিকতর সবুজক্ষেত্র তৃণমূল দলে, সেটাই স্বাভাবিক। তাদের মধ্যে কিছুও যদি জার্সি পালটে বিজেপিতে যোগ দেয় তবে পদ্মফুলের সংগঠন কিন্তু চাঙ্গা হতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

শহুরে বাঙালিদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' থাকার 'রোমান্টিকতা' আজও বহুলাংশে বহাল, তাই শহরের কলেজ ক্যান্টিনে বিজেপি-র গ্রহণযোগ্যতা হয়ত বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। কিন্তু 'অনুকরণযোগ্য' হিরো বা হিরোইন পেলে তারা যে চোয়াল শক্ত করে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেবে না, তা কে-ই বা হলফ করে বলতে পারে? আর গ্রামের মানুষের যেহেতু ওইসব ফালতু 'অহং' বা 'মুখোশ' নেই তাই গ্রামে গ্রামে শিবির বদলানোর পালা যে কোনও দিনই শুরু হতে পারে। আজকের রাজনীতিতে নিরানব্বই শতাংশ মানুষ যায় নিজস্ব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই। গত পাঁচ বছর বিরোধী শিবিরে টিকে গিয়েও এবার যারা হতাশ কিংবা তৃণমূলে গিয়ে যারা সুবিধে করে উঠতে পারে নাই এযাবৎ, সেই সব নেতা-কর্মীদের বেড়া টপকে পদ্মফুল শিবিরে যোগ দিতে খুব একটা সময় লাগবে কি?

সেই হিসেবে আর বাকি সব ঠিকঠাক চললে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে মূল লড়াই হচ্ছে ঘাসফুল বনাম পদ্মফুলের— অন্তত উত্তরবাংলায় তো বটেই। এটুকু এবারের

শহুরে বাঙালিদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' থাকার 'রোমান্টিকতা' আজও বহুলাংশে বহাল, তাই শহরের কলেজ ক্যান্টিনে বিজেপি-র গ্রহণযোগ্যতা হয়ত বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। কিন্তু 'অনুকরণযোগ্য' হিরো বা হিরোইন পেলে তারা যে চোয়াল শক্ত করে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেবে না, তা কে-ই বা হলফ করে বলতে পারে?

ফলাফল দেখেই বলে দেওয়া যায়। বাম ও কং নেতারা অদ্ভুতুড়ে জোট বেঁধে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে অনুমান করেছিলেন— ২০১৪ লোকসভায় প্রাপ্ত বিজেপির ভোট ছিল মোদি হাওয়ার ফল, এবারের বিধানসভায় তা সুড়সুড় করে নিজেদের পকেটেই চলে আসবে। সে আশায় বালতি বালতি জল ঢেলেছে বাংলার ভোটদাতারা— উত্তরবাংলায় আরও বেশি বেশি করে। নির্বাচনে পরাজয়ের পর বাম নেতারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন বিপেজিকে উৎসাহ দান বা গোপন আঁতাতের। অভিযোগ সত্যি-মিথ্যে যাই হোক না কেন, খাল দিয়ে ইতিমধ্যেই কুমীর যে ঢুকে পড়েছে! আগামী পঞ্চায়েত ভোটে তার অস্তিত্ব অনুভব করে যদি কেউ হঠাৎ করে শঙ্কিত হয়ে পড়েন তবে তা মোটেও অস্বাভাবিক হবে না।

সীমন্ত জানা

অপেক্ষা কেবল সাংগঠনিক উপস্থিতি ও যোগ্য নেতৃত্বের। বাংলার দক্ষিণভাগে এবার কোমর বেঁধে যে ভাবে নেমে পড়েছিলেন বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতা-নেত্রীরা, তার কিয়দংশও যদি উত্তরে থাকত তবে তাদের আসন সংখ্যা আরও দু-চারটি যে বাড়তে পারত সে ব্যাপারে একমত হবেন সবাই।

বেড়ালের গলায় এবার ঘণ্টা বাঁধবেন মমতা ?

ভোটের ফল বের হওয়ার পর বাংলার ট্রাডিশন অনুযায়ী হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে। ক্ষমতায় এসে বিরোধীদের ওপর হাতের সুখ করার রেওয়াজ অবশ্য নতুন কথা নয়। শাসক দলের দোষ যে পুলিশের নজরে ধরা পড়ে না, সেটাও এখন বঙ্গ জীবনের অঙ্গ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রাখতে হবে যে ২১১টা নয়, ২৩৫টা আসন ২০০৬-এ এ রাজ্যে পেয়েছিল বামফ্রন্ট। মাত্র পাঁচ বছর পরই তাঁদের কানে বেজে উঠেছিল নজরুলের গানের কলি, 'চিরদিন সবার সময় নাহি যায়/আজকে যে সে রাজাধিরাজ/ কালকে ভিক্ষা চায়'।

তৃণমূল সরকারের প্রতি হাজারো অভিযোগ সত্ত্বেও মানুষ যখন আরও একবার তাঁদের বিশ্বাস করেছেন, তখন সে বিশ্বাসের মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্নে এবার কঠোর হতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। দলের ছোট-বড়-মেজো নেতাদের প্রতি অভিযোগের অন্ত নেই। দুর্নীতি-সিন্ডিকেট-পেশি প্রদর্শন-দাদাগিরি ইত্যাদি রকমারি কান্ডে অভিযুক্ত 'ভাইবোন'-দের গুটিকয় অবশ্য এই ভোটে মুখ থুবড়ে পড়েছেন। স্রেফ ব্যক্তিগত ধান্ধার কারণে অন্যদল থেকে আসা নেতারাও কেউ কেউ খাবি খেয়েছেন ভোটের ফল বেরুবার পর। কিন্তু এই মুহূর্তে ২১১টি আসন পাওয়া দলের রুই-কাতলারা যে সবাই স্বচ্ছ এবং নির্ভেজাল— এটা মানুষ ভাবছে না। বস্তুত দলের সুযোগ সন্ধানী নেতাদের কর্মকান্ডে মানুষ বিরক্ত হলেও শেষাবধি ধরে নিয়েছেন যে 'সুপ্রিমো' সব কিছু জানতেন না। তাঁকে অসৎ বলে সিদ্ধান্ত নেননি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার।

কিন্তু দ্বিতীয় দফায় সরকারে এসে মমতা আর বলতে পারবেন না যে দলের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি স্রেফ 'বিরোধীদের চক্রান্ত'। সারদা থেকে নারদা, বিধাননগরের উড়ালপুল, সিভিক পুলিশ নিয়োগে প্রবল অনিয়ম, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, শিল্প আনার ব্যাপারে ফ্লপ হওয়া, পুলিশকে 'দলদাস' বানানো ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি যদি আগামী পাঁচ বছরে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারেন, তবে নজরুলের গানের কলিটি তাঁকেও শুনতে হতে পারে ভবিষ্যতে। হয়তো পাঁচ বছর পরেই।

তাই সবার আগে শুরু করতে হবে 'দলদাস' উপাধি থেকে পুলিশকে মুক্ত করার কাজ। সমাজে অপরাধ ঘটবেই। মমতাকে মনে রাখতে হবে যে তাঁর দলের নেতা-কর্মীরাও অপরাধী হতে পারে এবং তাই যদি হয় তবে পুলিশ যেন স্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে স্বচ্ছন্দে। এক কথায়, অপরাধ দমন করতে গিয়ে পুলিশ যেন বেছে বেছে বিরোধীদের না ধরে। মমতা হলেন তৃণমূলের শেষ কথা। আর এমন কেউ দলে নেই যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। প্রয়োজনে দলীয় কর্মীদের প্রতি কঠোর হতে পারাটাই তাঁর প্রথম চ্যালেঞ্জ।

> সবার আগে শুরু করতে হবে 'দলদাস' উপাধি থেকে পুলিশকে মুক্ত করার কাজ। সমাজে অপরাধ ঘটবেই। মমতাকে মনে রাখতে হবে যে তাঁর দলের নেতা-কর্মীরাও অপরাধি হতে পারে এবং তাই যদি হয় তবে পুলিশ যেন স্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে স্বচ্ছন্দে। এক কথায়, অপরাধ দমন করতে গিয়ে পুলিশ যেন বেছে বেছে বিরোধীদের না ধরে।

নারদার ফুটেজ জাল বলে প্রমাণিত হয়নি। দল বিপুল ভোটে জিতলেও সে

লোকে বলে ২০১১ সালে বামেরা হেরেছিল, আর ২০১৬ সালে মমতা জিতেছেন। অগণিত মানুষের এই আস্থা অটুট রাখার দায় কিন্তু জননেত্রীর একার।

'করে খাওয়া' নেতাদের আস্ফালন সহ্য করে দাঁতে দাঁত চিপে অপেক্ষায় আছেন। এটা চলতে থাকলে তৃণমূলের একটা বড় অংশ শেষাবধি বিদ্রোহ করতে বাধ্য হবেন। বিরোধীরা আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নাচবেন।

ফুটেজে দলীয় নেতাদের টাকা নেওয়ার ঘটনা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না। আগামীতে নারদকান্ড নিয়ে স্বচ্ছ তদন্তের নির্দেশ দেওয়াটা হতে পারে তাঁর সততার মুকুটে একটি উজ্জ্বল পালক। সারদা কান্ডেও ঠিক কী হয়েছিল, তা মানুষের সামনে তুলে আনার দায়িত্ব নেত্রীর ওপরেই বর্তায়। কোনও সন্দেহ নেই যে উক্ত দুটি কান্ড সম্পর্কে তিনি যত স্বচ্ছ থাকবেন, ততই দলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। তৃণমূলে থেকে দুর্নীতি কিংবা অভব্যতা করার অর্থ হল নেত্রীর বিষ নজরে পড়া— এই বার্তা যত দ্রুত দলের মধ্যে ছড়িয়ে যায় ততই মঙ্গল।

বলতে গেলে তৃণমূলের অন্দরেই একটা সংঘাত অনেকদিন ধরে চলছে। কর্মীদের একটা অংশ দলের নাম ভাঙিয়ে যে কোনও কুকর্মের বিরোধী হলেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছেন না। 'করে খাওয়া' নেতাদের আস্ফালন সহ্য করে দাঁতে দাঁত চিপে অপেক্ষায় আছেন। এটা চলতে থাকলে তৃণমূলের একটা বড় অংশ শেষাবধি বিদ্রোহ করতে বাধ্য হবেন। তখন বিরোধীরা আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নাচবেন। তার ফলে যে জোট তৈরি হবে তাঁর মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে সুপ্রিমোর পক্ষে। তাই দলের যোগ্য ও বিবেকবান নেতাদের দায়িত্ব দিয়ে 'করে খাওয়া' স্বার্থপর এবং 'দিদির নামে দাদাগিরি' করা নেতা কর্মীদের ছেঁটে ফেলা জরুরি। যারা দলকে ঢেলে সমর্থন জানিয়ে ফের মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী করলেন, তাঁরা কিন্তু এটা আশা করবেন এবং আশাহত হলে দ্রুত মুখ ফেরাবেন।

এই দেশে আধুনিক ভাবনাচিন্তার প্রথম বাহক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের উচিত এমন একটি সরকার পাওয়া যা উন্নত ও স্বচ্ছ প্রশাসন নিশ্চিত করবে। রাজ্যে এই ধরনের প্রশাসন থাকলে সেটা হবে কাজকর্মের পক্ষে অনুকূল। ছোট এবং মাঝারি শিল্পপতিরা যদি বুঝতে পারে যে বিনিয়োগের টাকায় 'তোলা' দিতে হবে না, তাহলে তাঁদের ফূর্তি না বাড়ার কোনও কারণ নেই। অনেকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে অনেক এমন শিল্প ছিল। বামপন্থীরা শ্রমিকদের ঐক্য গঠনের অজুহাতে সব মুছে দিয়ে গিয়েছেন।

বড় শিল্পের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে যে গত পাঁচ বছরে সাফল্য বলতে কিছুই পায়নি, এটা সবাই জানে। আগামী পাঁচ বছর যদি এটা অব্যাহত থাকে তবে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে রাজ্যের নবীন প্রজন্ম মমতাকে ক্ষমা করবেন বলে মনে হয় না। তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বে যত জন মাধ্যমিক পাশ করেছে, আগামী পাঁচ বছরে তাঁরা শুকনো প্রতিশ্রুতিতে ভুলবে না। কাজ চাইবে। মেলা, উৎসব, সাইকেল বিলি ইত্যাদি তখন আর মলম লাগাবে না নবীন প্রজন্মের বেকারত্বের ক্ষতে। তাঁর আমলে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি শূন্যে এসে ঠেকেছে। দান-ধ্যান করে সাময়িক সামাল দেওয়া যায়। কর্মসংস্থান একটি অতি জরুরি বিষয়। বাম আমলের দু' লক্ষ কোটি টাকা ধারের অজুহাত আগামীতে ক্লিশে হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে নীতিহীনতা, অপরাধ এবং অসভ্যতা অনেকদিন ধরে প্রশ্রয় পেয়ে 'সভ্যতা-ভদ্রতা' নামক মানবিক দিকগুলিকে অপমান করছে, তা দূর করার কাজ মমতাই শুরু করতে পারেন। ইতিহাস তাঁকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি বামদের মতো আলিমুদ্দিন নির্ভর নন, কংগ্রেসের মতো দিল্লির অধীন নন, বিজেপির মতো 'গোমাতা' নির্ভরও নন। তিনি ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু বদলে দিতে পারেন। সব হয়ত পারবেন না। কেউ পারেও না। কিন্তু সদিচ্ছার অভাব না থাকলে এমন একটা পশ্চিমবঙ্গ তো পাওয়াই যেতে পারে যেখানে পুলিশ-প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার নাক গলায় না, রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে মানুষকে খুন হয়ে যেতে হয় না, নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগ্যতা হয়ে পড়ে মূল্যহীন এবং বিবেকবান ও স্বচ্ছ মানুষেরা রাজনীতিতে আগ্রহ পায়, সর্বোপরি মত প্রকাশের অধিকার হয় অবাধ।

এসব করতে কিন্তু খরচা হয় না। আগামী পাঁচ বছরে এইটুকু তো করতেই পারেন মমতা। বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কাজটি আপনি শুরু করুন। মানুষ পাশে থাকবেই। রাস্তা হোক উন্নত, সে পথ বিদ্যুতের আলোয় ভেসে যাক। কিন্তু কিশোরী মেয়েটি যেন সে রাস্তায় নির্ভয়ে হাঁটতে পারে। সবুজ সাথীর সাইকেল নিয়ে যেন নিশ্চিন্তে পড়তে যেতে পারে গাঁয়ের মেয়েটি।

আগামী দিনগুলিতে এই আলো না দেখা গেলে কিন্তু মানুষ ক্ষমা করবে না।

অরুণকান্তি পন্ডিত

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 5,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

ভোট উৎসবেও ডুয়ার্সে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিরাম ছিল না

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

কোচবিহার 'অনুভব' নাট্যসংস্থা গত ৮ মে কবিগুরুর ১৫৬তম জন্মজয়ন্তী পালন করল স্টুডেন্ট হেলথ হোমে। অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও পরিবেশিত হয় বিভিন্ন শিল্পীর রবীন্দ্রগান ও কবিতা পাঠ।

কোচবিহার শিশুকিশোর নাট্যসংস্থার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী পালিত হয় ব্রাহ্মমন্দির প্রাঙ্গনে গত ৮ মে সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানে জেলার নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের নাচ, গান ও আবৃত্তির পাশাপাশি ছিল রবীন্দ্র প্রতিভার নানা দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা।

গত ৮ মে রবীন্দ্রনাথের ১৫৬তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে কোচবিহারের সংস্কৃতি গোষ্ঠী পূরবী। ওইদিন তাদের উদ্যোগে প্রথম অনুষ্ঠান ছিল প্রভাতফেরি, পরে সন্ধ্যায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রতিবারের মতো এবারও ৮ মে সন্ধ্যায় শতাধিক বর্ষ প্রাচীন গয়ারকাটা রিডিং ক্লাব যথাযথ মর্যাদায় পালন করে রবীন্দ্রনাথের ১৫৬তম জন্মজয়ন্তী। অন্যান্যবারের মতোই এবারও ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল এলাকার বিভিন্ন সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যশিল্পীরা।

যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আলিপুরদুয়ারে পালিত হল রবীন্দ্রনাথের ১৫৬তম জন্মজয়ন্তী। শহরের শিক্ষা, সংস্কৃতি মঞ্চ, রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র, অলিপুরদুয়ার সাংস্কৃতিক বিকাশ সংস্থা সহ একাধিক ক্লাব, সংগঠক ও শিক্ষা প্রষ্ঠিানগুলির সম্মিলিত উদ্যোগেই ওই অনুষ্ঠান। আলোচনায় অংশ নেন অর্ণব সেন, প্রমোথ নাথ, পরিমল দে, শান্তনু দত্ত, নির্মলকুমার ভট্টাচার্য, ড. দিলীপ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃতি, নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন পার্থ বড়ুয়া, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, অনুরাধা সরকার, ভাস্কর চৌধুরী, উর্মি রায়, অলোক চৌধুরী, দেবজয়া সরকার, চয়নি সূত্রধর, মানবেন্দ্র দাস, উত্তম চৌধুরী সহ একাধিক শিশু শিল্পীরা। সঞ্চালনা করেন অম্বরীশ ঘোষ, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, অভিষেক দে সরকার ও মহুয়া দাস।

এছাড়াও শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে পালন করা হয় কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সৌরভ চক্রবর্তী, দীপ্ত চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। রক্তদান শিবিরে মোট ২৮ জন রক্তদান করেন। তারমধ্যে একজন ছিলেন শারীরিক প্রতিবন্ধী।

বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ২৯ মে কোচবিহার জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে ল্যান্সডাউন হলে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে সবিতা রায়-এর কাব্যগ্রন্থ 'নিজস্ব যাপন' প্রকাশ করেন ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন ডুয়ার্সের বিভিন্ন কবি।

লোকসংস্কৃতি চর্চা

মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির মুক্তচিন্তা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে ২২ মে অনুষ্ঠিত হয় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক এক আলোচনাচক্র। ওই সভায় ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন গবেষক শচীমোহন বর্মণ, কৃষ্ণ কর্মকার প্রমুখ।

পরিবেশ দিবস উদযাপন

একটি গাছ যে পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে তার দ্বিগুণ কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাস থেকে টেনে নেয়। দেখা গিয়েছে একটি পরিণত গাছ বছরে প্রায় ২৭০০ কেজি অক্সিজেন জোগান দেয় প্রকৃতিকে। এই উষ্ণায়ণের যুগে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ সব থেকে জরুরি কর্তব্য। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সেই কর্তব্য গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে গয়ারকাটা প্রকৃতিপ্রেমী সংস্থা 'আরণ্যক' এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকশো কৃষ্ণচূড়া গাছ রোপণে উদ্যোগ নিয়েছে। ওইদিন তারা এলাকার বিভিন্ন পাড়ায় পরিবেশ সচেতনতারও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রতিবেদক: পিনাকী মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ সাহা, কৌশিক বারুই

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল- ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি- ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

কিডনি মাফিয়াদের ফের হানা বিন্দোলে ফাঁদ পাতছে মোবাইল ফোনে

অনেক রাতেই বেজে ওঠে ভরত জালির মোবাইল ফোন। এত রাতে আবার কার ফোন? অন্ধকার হাতড়ে মোবাইল স্ক্রিনে নম্বর দেখে বোঝা যায় না। 'হ্যালো'। অচেনা কণ্ঠ 'ভাই' সম্বোধন করাতে অবাক হয় ভরত। গ্রামের খবর, পড়শির খোঁজ, বউ-ছেলেমেয়ের কথা যেভাবে বলতে থাকে, তাতে তো চেনা বলেই মনে হয়। কিন্তু কে সেই মানুষ? গ্রামে কাজ নেই। চরম দারিদ্রে কোনওভাবে দিন চলে। অচেনা মানুষটা ভরতের সংসারের হালও সবিস্তারে বলে যায়। এতে আরও অবাক হয় সে। কে জানতে চাইলে ভিন রাজ্যের কাজের খোঁজ দেয় সে। টাকার অঙ্কটাও বেশ লোভনীয়। ভরত ঢোক গিলে জানতে চায়, কী কাজ। রাজমিস্ত্রির জোগানদার। ভরত চুপ করে থাকে। অচেনা মানুষ ঠান্ডা মাথায় তাকে চিন্তা করার জন্য দু'দিন সময় দেয়। ঠিক দু'দিন পরে ফের মাঝরাতে তার মোবাইল বেজে ওঠে। সে ভয়ে এবার আর ফোন ধরে না। সে রাতে তার আর ঘুম আসে না। এই বুঝি ফোনটা বেজে উঠল। কিন্তু না, রাতে আর কোনও ফোন আসেনি। পরের দিন দুপুরবেলা পশ্চিমপাড়া থেকে ভরত যখন হেঁটে আসছিল, তখন ফাঁকা পথের উলটো দিক থেকে একটা মোটর সাইকেল এসে তার সামনে দাঁড়ায়। পিছনে আর একজন বসে। 'কী চিন্তা করলে ভরত?' অচেনা সেই লোকের কণ্ঠস্বরে সে চমকে ওঠে। দু'জনেই মোটর সাইকেল থেকে নেমে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়। ভরত ভয়ে জড়সড়। আরোহী তার কাঁধে হাত রেখে বলে, 'মাস গেলে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা। নিজের খরচখরচার পরও বাড়িতে পাঠাতে পারবে পনেরো হাজার। বউ-বাচ্চাগুলো খেয়ে-পরে বাঁচবে।' ভরত কেঁদে ফেলে। আরোহীর দু'পা জড়িয়ে ধরে বলে, 'পারব না বাবু বউ-বাচ্চা ফেলে বিদেশ-বিভুঁই যেতে। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।' ভরতের অঝোর কান্নায় এবার ভয় পায় আরোহী। দ্রুত মোটর সাইকেলে স্টার্ট দেয়। অন্যজনও প্রায় লাফিয়ে ওঠে, 'ভরত, ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো, এমন সুযোগ আর এ জীবনে পাবে

না। কিন্তু কথাটা পাঁচকান হলে বউ-বাচ্চা সমেত শেষ হয়ে যাবে।' অনেক দূরে মিলিয়ে যায় সেই মোটর সাইকেল। ভয়ে সন্ত্রস্ত ভরত বেশ কয়েকদিন ঘরেই সিঁটিয়ে থাকে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা

সেই ফোন আর না আসায় সন্ত্রস্ত ভরত স্বাভাবিক হয়। একদিন সে গ্রামে তার কাছের মানুষ নবী জালিকে সবিস্তারে ফোনের কথা বলতে শুরু করামাত্র নবী বাকি অংশটুকু বলে দেয়। ক্রমে গ্রামের মানুষজনের চাপা গুঞ্জনে বোঝা গেল, বিন্দোল গ্রামের জালিপাড়া, পশ্চিমপাড়া মিলিয়ে প্রায় শ'দুয়েক দরিদ্র মানুষ এমন ফোন পেয়েছেন। প্রত্যেকের কাছেই ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজ দিচ্ছে সেই ফোন। যে কাজে মিলবে মোটা টাকা। কিন্তু ফোনের কথা জানাজানি হলেই সপরিবারে শেষ হয়ে যাবে— হুমকি।

গ্রামে কাজ নেই। ভাগে চাষ করে যেটুকু জোটে, তাও মহাজনের সুদ মেটাতে শেষ। হতদরিদ্র সেইসব মানুষ তাহলে কেন ফিরিয়ে দিলেন সেই প্রস্তাব?

বছর পাঁচেক আগের উপাখ্যান

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহর থেকে ২৮ কিমি দূরে সীমান্তবর্তী গ্রাম বিন্দোল এখন বাজে বিন্দোল বলেই পরিচিত। অথচ এই গ্রামেই চাষ হয় তুলাইপাঞ্জি ধানের। তবে এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষই বাস করেন দারিদ্রসীমার নিচে। বিশেষ করে বিন্দোলের জালিপাড়া, পশ্চিমপাড়া এলাকায়। কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষেরই নিজস্ব জমিজমা নেই। ভাগে চাষ, বাকি সময়ে দিনমজুরের কাজ। যোগাযোগব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য— সব দিক থেকেই অনুন্নত এক এলাকা।

বাজে বিন্দোল কথা

গ্রামের মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে একদল প্রতারক তাঁদের নিয়ে ব্যবসার ফাঁদ পাতে বছর পাঁচ আগে। কী সেই ব্যবসা— ভিন রাজ্যে কাজের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই ব্যবসায়ী চক্রের লোকজন। কখনও মুম্বই, কখনও চেন্নাই। হতদরিদ্র মানুষ লোভের ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারকদের হাত ধরে পৌঁছেও গেলেন সেই শহরে। তার পরের ঘটনা পড়ুন জালি পাড়ার রাজেন জালির মুখে। '২০১১ সালের মার্চ মাসে

আবদুল রজ্জাক আমাকে নিয়ে গেল মুম্বই। সেখানে মোটা টাকা মিলবে রাজমিস্ত্রির জোগানদারের কাজে। যেতে যেতে শুনলাম, ঠিকাদারি সংস্থাকে আমার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট দিতে হবে। রক্ত পরীক্ষা করাতে রজ্জাক আমাকে একটা নার্সিং হোমে নিয়ে গেল। তারা কয়েকটা কাগজপত্রে আমাকে দিয়ে টিপ ছাপ করিয়ে নিল। তারপর আমাকে ইঞ্জেকশন দিল। এর পর আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে আমি টের পাই, বাঁ দিকের তলপেটে খুব ব্যথা। নার্সিং হোমের নার্সরা জানায়, আমার অপারেশন হয়েছে, তাতে একটা কিডনি কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এরও দু'দিন পরে রজ্জাক এসে আমার হাতে গ্রামে ফেরার টিকিট আর বিশ হাজার টাকা দেয়। আর জানায়, ওই টাকা আমি রাজমিস্ত্রির জোগানদারের কাজ করেই পেয়েছি। কথার নড়চড় হলে বাড়িসুদ্ধু লোকের জান খতম।' একই গল্প বারুই জালি, গৃহবধূ জামিলা ও আরও অনেকের। তবু এঁরা তো কেউ দশ-বিশ হাজার টাকা হাতে পেয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেই গ্রামে ফেরার টিকিট আর হুমকি ছাড়া আর কিছুই পাননি। এইভাবে প্রায় শ'দুয়েক মানুষ মোটা টাকার লোভে মুম্বই-চেন্নাই গিয়ে শুধু প্রতারিতই হননি, হারিয়েছিলেন তাঁদের একটি কিডনি। এর পরই বিন্দোল গ্রামের আগে জুড়ে যায় বাজে কথাটি। তাই আজ আর কেউ ভিন রাজ্যে কাজের বিনিময়ে মোটা টাকার ফাঁদে পা বাড়াতে রাজি নন।

কিন্তু ভরত, নবীর মতো ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছেন শিবু, রতন, জগৎ, মিলাদের মতো সবাই, কারণ ফোনে সবাই হুমকি পেয়েছেন, পাঁচকান হলেই ঘরসুদ্ধ শেষ করে দেওয়া হবে। দু'-একজন মোটর সাইকেল আরোহীও শাসিয়ে গিয়েছে। গ্রাম জুড়ে সন্ত্রাসের ছায়া। সেবার ৩২ বছরের তরতাজা যুবক রাজেন জালি, ৪৫ বছরের বারুই জালি, ৩০ বছরের জামিলা, শিবেন, চোটেন-সহ আরও অনেকেই রজ্জাক, কুদ্দুসদের সঙ্গে মুম্বই-চেন্নাই গিয়ে একটা কিডনি খুইয়েছিলেন। কেউ কেউ দশ-বিশ হাজার নিয়ে ফিরলেও বেশির ভাগই শুধু হুমকি শুনে খালি হাতেই ফেরত এসেছিলেন। এখন ওঁরা কেউই কোনও ভারী কাজ করতে পারেন না। একটু জোরে হাঁটাচলা করলেই ধুঁকতে থাকেন।

স্থানীয় প্রশাসনে জানাজানি হবার পর রজ্জাক-কুদ্দুসের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়। এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এরকম অবস্থায় বিন্দোলে ফের হানা দিয়েছে সেই মাফিয়াচক্র অথবা নতুন কেউ। জেলা পুলিশ সুপার অমিতকুমার ভারত রাঠোর জানান, কিডনি হোক কিংবা যা-ই হোক, বিন্দোলে যে মাফিয়াচক্রই ফাঁদ ফেলুক, পুলিশের জালে তারা ধরা পড়বেই। তবে এবার আর গ্রামবাসীকে সহজ লোভের ফাঁদে ধরা যাবে না। সীমান্তবর্তী গ্রাম হওয়াতে বিন্দোল চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্য। আর বিন্দোলের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রের চরম সীমায় থাকায় প্রতারকের লোভের ফাঁদে তারা সহজেই ধরা পড়ে। এবারও কি তেমনটাই ঘটবে?

জ্ঞান ফিরলে আমি টের পাই, বাঁ দিকের তলপেটে খুব ব্যথা। নার্সিং হোমের নার্সরা জানায়, আমার অপারেশন হয়েছে, তাতে একটা কিডনি কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এরও দু'দিন পরে রজ্জাক এসে আমার হাতে গ্রামে ফেরার টিকিট আর বিশ হাজার টাকা দেয়।

তন্ময় চক্রবর্তী

যে পথে ৪৫ জোড়া মেল ট্রেন চলে, একটিও থামে না

মালদা টাউন ও ভালুকারোড এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন কুমারগঞ্জে তিস্তা তোর্সা ও হাটে বাজারে এক্সপ্রেস পূর্ব ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্টপেজ না পাওয়াতে আট ঘণ্টা ব্যাপী রেলপথ অবরোধ হয়েছিল। সে খবর প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই শিরোনাম হয়েছিল। কিন্তু তাতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তাদের ঔদ্ধত্যে আঁচড় লাগেনি। তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল উন্নাসিক। কুমারগঞ্জ, আদিনা, একলাখি, ভালুকারোড, হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি স্টেশনগুলোর পার্শ্ববর্তী এলাকায় গোটা মালদার জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ বাস করেন। উত্তর মালদার বিস্তীর্ণ অংশের জনংখ্যা আঠারো লক্ষেরও বেশি। নিউজলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলা, অসম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৪৫ জোড়া মেল এক্সপ্রেস, সুপারফাস্ট, শতাব্দী এক্সপ্রেস, রাজধানী এক্সপ্রেস, গরীবরথ এক্সপ্রেস ধুলো উড়িয়ে ছুটলেও হরিশ্চন্দ্রপুর, ভালুকারোড, কুমারগঞ্জ স্টেশনে কোনও ট্রেনই দাঁড়ায় না। ইংরেজ আমলের এক কামরূপ এক্সপ্রেসের কথা বাদ দিলে দিল্লি, কাশ্মীর, গুজরাত, মুম্বই অপরদিকে চেন্নাই, তিরুবনন্তপুরম, বেঙ্গালুরুবু কোনও সুপারফাস্ট ট্রেনই ভালুকারোড, হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে দাঁড়ায় না। হাওড়াগামী কামরূপ এক্সপ্রেস এইসব স্টেশন দিয়ে চলে যায় রাত দুপুরে যখন কাকপক্ষীও জেগে থাকে না। কলকাতা-কাটিহার যোগবাণী এক্সপ্রেস-এর স্টপেজ নিয়েও উত্তর-পূর্ব সীমন্ত রেল কর্তৃপক্ষ কার্যত এক প্রহসন চালিয়েছে। এটি বেসরকারিভাবে সামসি স্টেশনে দাঁড়ায় বটে কিন্তু কম্পিউটারে এটির কোনও সময় সারণি নেই। স্টেশন মাস্টাররাও কলকাতা-যোগবানী ট্রেনের স্টপেজ আছে কি নেই, সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন না। বছরখানেক ধরে এ ব্যাপারে তামাশা চালাচ্ছেন রেলকর্তারা।

কাটিহার ডিভিশনের রেলকর্তারা ওই ট্রেনটির সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, কম্পিউটারে দেখে নিন। রেল কর্তাদের বিলাসবহুল জীবন, অত্যন্ত দায়সারা মনোভাব, গয়ংগচ্ছ মানসিকতা, আমলাতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য, বিভাগীয় রেল দপ্তরে না থেকে দিল্লির রেল ভবনে ঘুরে বেড়ানো, রেল পরিচালনায় নজর না দেওয়া মালদা-কাটিহার ডিভিশনের রেল চলাচলকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছে। অথচ নাজেহাল হচ্ছেন অসংখ্য যাত্রী।

শিয়ালদামুখী দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস, হাওড়ামুখী এসি এক্সপ্রেস, এ অঞ্চলে দাড়ানোর প্রশ্নই নেই। সামান্য রাঁচি এক্সপ্রেস, পুরী এক্সপ্রেস, কামাক্ষা এক্সপ্রেসও এখানকার কোনও স্টেশনেই দাঁড়ায় না। যাত্রীরা যে সহজে শিলিগুড়ি যাবেন তার উপায় কই? অগত্যা এ অঞ্চলের যাত্রীরা ৭০-৮০ কিমি দূরের মালদা টাউন স্টেশনে বাসে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে পৌঁছে তারপর ট্রেন ধরেন। এ অঞ্চলে দাঁড়ায় না ব্রহ্মপুত্র মেলও। মালদা টাউন স্টেশনে সীমিত প্ল্যাটফর্ম থাকায় মালদা টাউনের অ্যাপ্রোচ স্টেশনে (ওল্ড মালদা) গড়ে কুড়ি থেকে ত্রিশ মিনিট প্রতিটি ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। অথচ হরিশ্চন্দ্রপুর, ভালুকারোড স্টেশনে দিল্লিগামী মেল এক্সপ্রেস ট্রেনকে বা বেঙ্গালুরুমুখী যশবন্তপুর এক্সপ্রেসকে দু-আড়াই মিনিট স্টপেজ দিতে হলে রেল কর্তাদের গাত্রদাহ হয়।

স্থানীয় মানুষের এ নিয়ে ক্ষোভ বা বিরক্তি এখন উদাসীনতায় পৌঁছে গেছে। তাঁদের বক্তব্য, এলিট শ্রেণির রেলকর্তারা কলোনিয়াল হ্যাংওভারে ভুগছেন। মালদা টাউনের বাইরেও যে মালদা জেলা আছে, রঙিন চশমা পরা রেলকর্তারা সেসব বুঝতে নারাজ। তাঁরা মালদার ট্রেন বলতে একমাত্র গৌড় এক্সপ্রেসকেই বুঝে থাকেন। আদতে গৌড় এক্সপ্রেস ইংলিশবাজারের ট্রেন যার পরিষেবা উত্তর মালদা পায় না। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে চলা সুপার-ডুপার এক্সপ্রেসের কথা বাদই দিলাম, ছ-বগির ছোট মালদা-কাটিহার ডেমু নিয়েও মালদা ও কাটিহার ডিভিশনের রেলকর্তারা স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছেন বলে এ অঞ্চলের মানুষের অভিমত। তাই বেলা ৩-৩০-এর মালদা-এনজেপি লোকাল কোনও দিন পাঁচটায়, কোনও দিন ছাড়ছে সন্ধ্যা ছ'টায়। এই ডেমু ছাড়বার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও, রেলকর্তারা ট্রেন সম্পর্কে কোনও তথ্যই যাত্রীদের দিতে ইচ্ছুক থাকেন না। কেবল মাত্র এই ডেমুটিই যে রোজ তিন-চার ঘণ্টা বিলম্বে চলে তাই নয়, ৫টা ১৫-র মালদা-কাটিহার ডেমুরও একই হাল। ট্রেনটি কোন প্ল্যাটফর্মে আসবে জানতে চাইলে কাউন্টার থেকে উত্তর মেলে, প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর পরই সেটা দেখতে পাবেন। দেরিতে চলা ট্রেনের সময় জানতে চাইলে বলা হয়, ট্রেন আসলেই দেখতে পাবেন! চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য ও সীমাহীন বিশৃঙ্খলা প্রতিটি রেল অফিসার ও কর্মচারীদের চলাফেরায়, সাধারণ মানুষ যার প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেছে কারণ তাদের ভাষায়, এর কোনও প্রতিকার নেই। তাদের মতে, রেল কর্তাদের বয়েই গেছে জানতে যে ভালুকারোড, কুমেদপুর, কুমারগঞ্জ স্টেশন থেকেও বহু যাত্রীর বাড়ি পৌঁছতে আরও দেড়-দু'ঘণ্টা সময় লাগে।

ইদানীং শিলিগুড়িমুখী ডেমুকে সকালে মালদা কোর্ট স্টেশন থেকে চালানো হচ্ছে, ফলে যাত্রীদের অসুবিধা, বিড়ম্বনা এবং হয়রানি মাত্রাছাড়া হচ্ছে। বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে কারণে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের যাত্রীরা আর আলিপুরদুয়ারে যেতে পারছে না। উত্তর মালদার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের অসহায় প্রশ্ন, আধুনিক ভারতীয় রেলযাত্রায় এমন নৈরাশ্যজনক ও হতাশাপূর্ণ পরিষেবার অভিজ্ঞতা আর কি কোথাও মিলবে?

শান্তনু বসু

ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরের অভাব আজও উত্তর মালদায়

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, বিশেষ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বহু নতুন শাখা খুলেছে। অথচ চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি, ভাদো, রতুয়া, মানিকচক, মথুরাপুর, শোভানগর, মিলকি, আশাপুর, তুলসীহাটা প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্র ও জনাকীর্ণ এলাকায় বিগত ৪০-৫০ বছরে একটি ব্যাঙ্কের শাখাও খোলা হয়নি। গত ৫০ বছরে গ্রাহকসংখ্যা অন্তত পনেরো-কুড়ি গুণ বেড়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্রাঞ্চ তো দূরের কথা, যে সামান্য সংখ্যক এটিএম খোলা হয়েছে, সেগুলিও অধিকাংশ দিন বন্ধ থাকে। যেমন চাঁচল বাজারের এটিএম অধিকাংশ দিনই বন্ধ থাকে। চাঁচলের মূল ব্রাঞ্চ সংলগ্ন এটিএম-টি বন্ধ থাকে প্রায় দিনই। খোলা থাকলেও কাজ করে না। এসি'ও বন্ধ থাকে। টাকা তোলবার সময় গ্রাহকদের দম বন্ধ হয়ে আসে।

চল্লিশ বছর আগের সামসি স্টেট ব্যাঙ্কের চেহারাটা অনেকটা পায়রার খোপের মতো। গ্রাহকদের উপচে পড়া ভিড়ে ব্রাঞ্চের ভিতরে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। সংকীর্ণ করিডরে চলাচলই দায়। অন্য গ্রাহককে 'লাথি' না চালালে, কনুইয়ের গুঁতো না মারলে ব্রাঞ্চের অন্য কাউন্টারে যাওয়া যাবে না। চাঁচল ব্রাঞ্চে গ্রাহকসংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি, সরকারের নতুন নতুন ফতোয়া— ছাত্রদের জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্রাঞ্চগুলো বেসামাল।

ব্যাঙ্কের স্থান সঙ্কুচিত হওয়ায় গ্রাহকদের লাইন ক্রমশ বাইরে প্রসারিত হচ্ছে। কাজেই ব্যাঙ্কে ঢোকাটাও এক বড় সমস্যা। গ্রাহকদের জন্য চেয়ার আছে সাকুল্যে ৭-৮টি, কিন্তু সবসময়ই নারী-পুরুষ গ্রাহকের সংখ্যা দুই থেকে আড়াইশো। ধাক্কাধাক্কি এবং দীর্ঘ লাইন এই ব্রাঞ্চের বৈশিষ্ট্য। আর বিসদৃশ ব্যাপার হল, লক্ষ লক্ষ টাকা ডিপোজিট করতে আসা ব্যবসায়ী ও জিরো ব্যালেন্সধারী ছাত্রছাত্রীরা একই লাইনে। কারণ কাউন্টার বাড়ছে না। তুলসীহাটাতে এসবিআই-এর নতুন শাখা খোলবার কথা বছরখানেক আগে শোনা গিয়েছিল। সেটা বিশ বাঁও জলে।

ইউবিআই-এর যে একটি মাত্র শাখা চাঁচলে আছে, ভিড় সেখানেও। এর স্পেস চাঁচল এসবিআই কাউন্টারের চেয়েও ছোট। কোথায় দাঁড়াবেন গ্রাহকরা? সামসির ভাদোতে, রতনপুরে, রতুয়াতে ইউবিআই নতুন শাখা খোলেনি। পিএনবি, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ চাঁচলে, হরিশ্চন্দ্রপুরে, আশাপুরে, খরবাতে, মালতীপুরে, গোবিন্দপাড়াতে, রতনপুরে, রতুয়াতে নতুন নতুন শাখা না খুললে গ্রাহকদের গুঁতোগুঁতি, লাথালাথি, কনুইয়ের ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি, কথা কাটাকাটি চলতেই থাকবে।

বিগত পঞ্চাশ বছরে উত্তর মালদহের জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে প্রায় ছয়/সাত গুণ, কিন্তু না বেড়েছে পোস্ট অফিসের সংখ্যা, না বেড়েছে ব্যাঙ্কের সংখ্যা। চাঁচলের পোস্ট অফিস নির্মিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে। চাঁচলের স্টেট ব্যাঙ্কে সরু লোহার দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে যেমন গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়, পোস্ট অফিসেও তেমনি। আবার পোস্ট অফিসের কর্মীরা যখন-তখন পোস্ট অফিসের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিচ্ছেন। চাঁচলের পোস্ট অফিসের দরজা যে কোনও সময় বন্ধ হওয়ার কারণ জানতে চাইলে নানা অজুহাত দেন কর্মীরা।

কুড়ি বছর আগে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস কর্মকর্তাদের ব্যবহার মানুষকে মুগ্ধ করত। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসের কর্মকর্তারা গ্রাহকদের চিনতেন এবং পরিচয় থাকত। এখন চাঁচলের স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদের সঙ্গে দেখা করতে হলে অর্থাৎ এসি রুমে ঢুকতে হলে সিকিয়োরিটি স্টাফদের অন্তত চোদ্দোবার কৈফিয়ত দিতে হবে! সিকিয়োরিটি স্টাফদের দুর্ব্যবহার লাগামছাড়া।

অর্থাৎ চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি, ভাদো, রতুয়া, মানিকচক, মথুরাপুর, শোভানগর, মিলকি, আশাপুর, তুলসীহাটাসহ উত্তর মালদহে জনবিস্ফোরণ ঘটলেও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও পোস্ট অফিসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেনি। যে কারণে নানা ভুঁইফোঁড় সংস্থা, যেমন সারদা, অ্যালকেমিস্ট প্রভৃতি কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার সুযোগ পেয়েছিল। মূল ত্রুটি হচ্ছে, ব্যাঙ্ক এবং পোস্ট অফিসে কর্মী নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নতুন নতুন শাখা খোলাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে মানুষ অসৎ সংস্থাগুলির কবলে পরে বারবার সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। **নিজস্ব প্রতিনিধি**

প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ হল দক্ষিণ দিনাজপুরে

জুন মাসের পয়লা তারিখ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কোটপা অর্থাৎ সিগারেটস অ্যান্ড আদার টোবাকো প্রোডাক্টস অ্যাক্ট চালু করল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে এই আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছিল। ২০০৪ সাল থেকে কোনও কোনও রাজ্যে তা প্রয়োগ হলেও এ রাজ্যে কার্যত প্রথম প্রয়োগ হল দক্ষিণ দিনাজপুরে। জেলার মুখ্য আধিকারিক ডা. সুকুমার দে জানান, 'জেলাশাসককে চেয়ারম্যান করে ২৬ মে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। সেখানে জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ, পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের প্রতিনিধিরা

রয়েছেন। বস্তুতপক্ষে এদিন থেকেই প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়।' প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ধূমপান প্রতিরোধ করতে যে বদ্ধপরিকর সেটা যেমন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অন্যদিকে এভাবে ধূমপান প্রতিরোধ করা নিয়ে বালুরঘাট শহরে ধূমপায়ী ও অধূমপায়ীদের মধ্যে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ধূমপায়ী সনাতন গোস্বামী বলেন, 'এই আইন কার্যকর হওয়ায় বিস্তর সমস্যা আছে। উপর থেকে আইন না চাপিয়ে দিয়ে সচেতন করাটা বেশি জরুরি।' অন্যদিকে, অধূমপায়ী মিহির কর্মকার জানান, 'আমরা যারা বিড়ি, সিগারেট খাই না তারা অধিকাংশ সময়ই প্যাসিভ স্মোকিংয়ের স্বীকার। মনে হয় এবার সমস্যার সুরাহা হবে। কার্যত কতটা কী হবে তা বলবে সময়।

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

বন্যাভবন

জলপাইগুড়ি শহর তিস্তা নদী থেকে বেশ নিচে। তদুপরি ফি বছর করলা উপচে

ভাসিয়ে দেয় পুর এলাকার বেশ কিছু বসতি। লোকে গেরস্থলী, পালিত পশু নিয়ে রাস্তায় বা বাঁধে এসে ওঠেন। বানভাসিদের জন্য তাই স্থানীয় পুরসভা তিনটি ভবন বানাতে চাইছে শহরের দুই প্রান্তে। পুরবাসী শুনে বলছেন উদ্যোগ সাধু তবে, পরের স্টেপ হওয়া উচিত বর্ষায় শহরের অলিগলিতে পৌর নৌকো চালু করা। নয় তো অনেকে বন্যাভবনে পৌঁছতেই পারবেন না। ভাবার বিষয়!

পর পর তিন

হ্যাট্রিক! হ্যাঁ। পরপর তিন বছর মাধ্যমিকের ফলাফল শেষের দিক থেকে প্রথম হয়ে হ্যাট্রিক করল জলপাইগুড়ি জেলা। জেলাবাসীর দুঃখের শেষ নেই। জেলায় সাকুল্যে পাশের হার ৭০ শতাংশ। ফেলের হার পাশের হারের চাইতে প্রতিবছর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারি ভাবনায় শিক্ষা দপ্তর। এই ফেল বৃদ্ধির পশ্চাতে মূল কারণ হিসেবে আঙুল দেখানো হয়েছে এই এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থাকে। চা-বাগান কেন্দ্রিক সমস্যায় জর্জরিত ছাত্র-ছাত্রীরা গভীরভাবে প্রভাবিত বলে মত শিক্ষা পর্যদের। এটা অবশ্য ভাবার কথা। কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে গো! এই হ্যাট্রিক চাইনে কো আর! মাধ্যমিকে ফেল করার কঠিন দিনে এ কি কান্ড!?

তবে?

আপনার সন্তান কি হোয়টসঅ্যাপ-ফেসবুক করে? ছেলেমেয়ের কথা বাদ দিন, আপনি করেন? না করলে আজই খুলে ফেলুন অ্যাকাউন্ট। হোয়াটস অ্যাপই খুঁজে দিল নিখোঁজ সন্তান। হৃত্বিক ঘটকের সিনেমার মতো 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'ছিল এক কিশোর। আসাম থেকে আসামীর মতো পালিয়ে এসে পৌঁছেছিল ডুয়ার্সের নিউ আলিপুরদুয়ার রেল স্টেশনে। অবশেষে আরপিএফ এর খপ্পরে পড়ে স্বীকারোক্তি জানায় কিশোর এবং হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগে মা খুঁজে পেলেন হারানো নিধি। এরপরেও প্রযুক্তিকে দোষ? মানছি না, মানব না!

বিয়েশান্তি?

আগেকার দিনে মানুষ ব্যাংয়ের বিয়ে দিয়ে বৃষ্টি কামনা করতো। এখনও করে। মানুষের কামনার শেষ নেই। আবার বিশ্বাসেরও অন্ত নেই। এখনও আমরা প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত রোদ-বৃষ্টি এক সাথে দেখলেই বলে উঠি আজ নিশ্চিত শিয়ালের বিয়ে। তো ব্যাপারটা হল যে, 'বিয়ে' একটা আনন্দের উৎসব/বিশ্বাস/সংস্কার। নাহ্ এবার আর রহস্য না করে খোলশা করি ব্যাপারটা। ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকাগুলির ভিতর এখনও রয়ে গিয়েছে গভীর কুসংস্কার ও বিশ্বাসের বীজ। তারই নমুনা জলপাইগুড়ির মোহিত নগরে প্রতিফলিত হতে দেখা গেল আর একবার। না এটা ব্যাঙ বা শিয়ালের বিয়ে নয়, খোদ বট গাছের সাথে পাকুড় গাছের সাত পাকে বাঁধা, থুড়ি! ওরা বোধ হয় পাক খেতে জানে না। তবে, বৃষ্টি নয়, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতেই এমন কাজ বলে কেউ কেউ বলছেন। ডুয়ার্সে তো বৃষ্টি হচ্ছিলই। কিন্তু শান্তি রক্ষায় গাছের কী ভূমিকা? আর, কে কবে বলেছে যে বিবাহের মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হয়?

ভাগাড় নং ৩১

হ্যাঁ, ৩১সি নং জাতীয় সড়ক বর্তমানে ভাগাড়েই পরিণত হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর যে কেহ বা কাহারা চুপিচুপি এসে এই এলাকায় পচাগলা আলুর বস্তা ফেলে ভাগলবা। আশ্চর্য! কিছুদিন আগেও আলুর দাম যেখানে ছিল আকাশছোঁয়া! অথচ এখন রাস্তার ধারে গড়াচ্ছে পচাগলা লাশের মতো। এই এলাকা দিয়ে নিত্য যাত্রীরা রীতিমতো তর্জনগর্জন তুলেছেন নাক শিটকে। উঃ কী গন্ধরে বাবা। আগে, মানে এই 'আলু কান্ডের' আগে নাকি বেশ কয়েকটা তাগড়াই চেহারার গরুও মরে পড়ে ছিল এই রাস্তার ধারেই। তাই যাত্রীদের রীতিমতো নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড়। সম্ভবত অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার আগেই প্রশাসনের টনকটা কিঞ্চিৎ নড়ে ওঠা উচিৎ, তাই না? না লোকে অভিশাপের ভাষা বদলে বলবে, হয় নরকে নয় থার্টি ওয়ান সি-তে যা!

হস্তি ও অস্বস্তি

হাতিটি দাঁড়িয়ে ছিল। জঙ্গলে। বয়স হয়েছে তাই তাকে নিয়ে রীতিমতো আশঙ্কায় বনবিভাগ। সে আবার দাঁতাল। মে মাসের ৫ তারিখ থেকে টানা ৬ দিন

পাচার

স্কুল শিক্ষকের কাজ পড়ানো। সেটাই মন দিয়ে করা উচিত। তবে তা করে মনে হয় আজকাল আর পেট চলছে না। না হলে এমন দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন ডুয়ার্সের এক শিক্ষক? ধরে ধরে তক্ষক পাচার করে দিচ্ছেন! ওহে শিক্ষক, তুমি ছাত্রকূলের রক্ষক, আর পাচার করলে তক্ষক?

সর্বোচ্চ মাধ্যমিক

প্রথমে মাধ্যমিক, তারপর উচ্চ মাধ্যমিক, শেষে সর্বোচ্চ মাধ্যমিকের ফল বেরুলো। কিন্তু শেষের মাধ্যমিকটা আবার কবে হল দাদা? শুনে জলঢাকা লাগোয়া পথে এক রসিক পথচারি বললেন, 'আরে ওটা ফি বছর হয় না। এবার হয়েছে। সাত দিনে সাতটা পেপার। কেউ একটা বেশি পেপারে পরীক্ষা দিতে পারেনি। টুকলি-নকল ইত্যাদি ছিল। পরীক্ষার খাতা কড়া পাহারায় রেখে এই তো সেদিন দেখা হল। একদিনেই পরীক্ষকরা দেখে দিলেন। দিদি ২৯৪-এর মধ্যে ২১১ পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে। এবার বুঝলেন তো?'

হাতিটি রেতির জঙ্গল লাগোয়া বান্দাপানি চা-বাগানের একটি বাতিল অংশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে নাকি আরেক দাঁতালের তাড়া খেয়ে চম্পট দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে। এর আগে এরকম বয়স্ক দাঁতাল হাতিদের অনেক বয়স্ক সাথীকে পাচারকারীদের বন্দুকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাই এই গম্ভীর ভদ্রলোক (হাতি)টিকে নিয়ে এখন রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গিয়েছে বনকর্মীরা। টহলপর্ব চলছে আশঙ্কাটা হল এই যে, সে যাতে জঙ্গল ত্যাগ করে লোকালয়ে না ঢুকে পড়ে। এ বিষয়ে হাতিটির কোনও বক্তব্য জানা যায়নি।

টুকরাণু

ধূপগুড়ি শহরে ফের অজানা প্রাণীর পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। টোটো আইন সম্মত কি না এ নিয়ে ডুয়ার্সের আনাচ কানাচে তক্কো চলছে। মাধ্যমিক পাস করেও আত্মহত্যা করেছে এক ছাত্র। তিস্তায়। ময়নাগুড়ির কাছে। প্লাস্টিকের নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগ ডুয়ার্সে দিব্যি সিদ্ধ। তিস্তা খাঁ খাঁ। তিস্তাবুড়ির পুজো তাই শুরু হয়েছে। জোর গুজব যে ডুয়ার্সে বামফ্রন্টের ছোট শরীকরা এবার বিদ্রোহ করবেন। সৌরভ চক্রবর্তী কোন মন্ত্রীত্ব পাবেন তাই নিয়ে আলিপুরদুয়ারে বাজি।

ডুয়ার্স ব্যুরো

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা

এখন ডুয়ার্স-এর উদ্যোগে এরকমই একটি অভূতপূর্ব সংকলন প্রকাশিত হবে আগামী জুন মাসে। এই অঞ্চলের খ্যাত-অখ্যাত কবিদের নিজস্ব বাছাই কবিতাগুচ্ছ থাকছে এই সংকলনে। স্বভাবতই কলেবরে আয়তনে দশাসই হবে বলাই বাহুল্য। ডুয়ার্সের যাঁরা এ যাবৎ কবিতা পাঠিয়েছেন,তাঁদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। যাঁদের কবিতা এই সংকলনে মনোনিত হয়েছে তাঁদের কাছে ইতিমধ্যেই চিঠি বা মেল পাঠানো হয়েছে পরবর্তীতে কী করতে হবে তা জানিয়ে। চিঠি বা মেল না পেলে সত্বর যোগাযোগ করুন। মেল করুন ekhonduars.sahitya @gmail.com কিংবা ফোন করুন অমিতকে (৯৬৪৭৭৮০৭৯২)। এই সংকলনটি প্রকাশিত হবে আগামী ২৫ জুন, ২০১৬ তারিখে।

পারবি, তুইই পারবি

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

সেদিন ডুয়ার্সের আকাশ ঘনঘোর। হঠাৎ করেই পালটে গেল আকাশের পুরো অবয়ব। টিফিনের সময় পেরিয়ে ফিফ্‌থ পিরিয়ড শুরু হতে চলেছে। হেড স্যার দোলাচলে পড়ে গিয়েছিলেন। স্কুল ছুটি দিয়ে দেবেন? আবার বাতাসের ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, মেঘ বুঝি কেটেই যাবে। শুধু শুধু পড়ার ক্ষতি করে লাভ কী! মধ্যবিরতির আনন্দ কলরোল থেমে গেল। স্যার-ম্যাডামরা পঞ্চম ক্লাসে ঢুকে পড়লেন। চুপচাপ স্কুল। হঠাৎ জোর বাজ ডাকল। চমকে উঠলেন হেড স্যার। কী অন্ধকার হয়ে এল চারধার।

নাহ্, ছুটি দিয়ে দেয়াই উচিত। ডুয়ার্সের বৃষ্টির ধরন জানেন হেড স্যার। আটকে পড়লে মুশকিল। বৃষ্টি নামলে ছাড়তেই চাইবে না। ছাতাও তো আনেনি বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে। বরঞ্চ বৃষ্টি নামতে নামতে বাড়ি পৌঁছে যাবে। সবারই প্রায় সাইকেল আছে।

চতুর্থ শ্রেণির কর্মীকে ঘণ্টা বাজাতে বললেন হেড স্যার। পঞ্চম পিরিয়ডের শেষাশেষি আকস্মিক ছুটিতে সকলে খুশি। গরমের পর চারদিক ঠান্ডা হয়ে আসায় সবাই বেশ নিস্তারের আনন্দে।

ছুট ছুট ছুট...! নিমেষে সাইকেল স্ট্যান্ড খালি হয়ে গেল। ওরা ছুটতে জানে! গ্রামের পথে পথে বৃষ্টি তাড়িয়ে চলা সাইকেলের দৌড়!

বাইকে স্টার্ট দিলেন স্যাররাও। হঠাৎ এক স্যারের নজরে পড়ল স্কুল গেটের ঠিক বাইরে। ক্লাস সেভেনের মেয়েটির সাইকেলের চেন পড়ে গিয়েছে। হাওয়াও চলে গিয়েছে। একা সাইকেল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে।

—কী রে, বৃষ্টি নামবে। একটা কাজ কর। স্কুলে সাইকেল রেখে আমার বাইকে উঠে পড়। আমি ওদিক দিয়েই তো যাব। তোকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যাব।

—না স্যার, কাল সকালে আমার টিউশন আছে। সাইকেল ছাড়া খুব অসুবিধে হবে।... চলে যাব ঠিক।

বাধ্য হয়ে স্যার চলে গেলেন। তাঁকেও বৃষ্টিকে হারিয়ে দশ কিলোমিটার দূরে বাড়ি পৌঁছাতে হবে।

বৃষ্টিসম্ভাবী মেঘ দেখতে দেখতে সাইকেল হাতে জোরে হাঁটতে লাগল ক্লাস সেভেনের সেকেন্ড গার্ল।

জোরে বাড়ির দিকে ছুটছে গোরু-ছাগল। ভুটান পাহাড় থেকে যেন হু-হু করে আসছে দস্যি মেঘের দল। তোলপাড় আকাশ। পাখিদের কচি আর্তনাদে চার দিন কেমন কেমন ভয় পাওয়ানো। বিদ্যুৎ চিরে দিচ্ছে চিকরাশিবনের মাথা।

ফাঁকা হয়ে গিয়েছে গ্রামের রাস্তা। আঁকাবাঁকা মেঠো পথ কেমন ছমছমে হয়ে উঠল নিমেষে। মেয়েটির ভয় করতে লাগল। ইস্, স্যারের সঙ্গে গেলেই ভাল হত।

বাঁশঝাড়টির কাছে আসতেই ভয় বাড়তে লাগল। চেনা পথটা নিমেষে কেমন অচেনা। আর বেশি দূর নয় বাড়ি। মা হয়ত খুব চিন্তা করছেন। দাদারাও। প্রবল মেঘে দিনটা কেমন গাঢ় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

হঠাৎ ছিটকে পড়ল তার সাইকেল। ক্লাস সেভেনের ফুটফুটে মেয়েটি বুঝতে পারল না কী হল। তার হাতে আর সাইকেলের হ্যান্ডেল নেই। পা থেকে চটি খসে পড়ল। পিছন থেকে তাকে জাপটে তুলে নিয়েছে কেউ। চিৎকার করতে চাইল, কিছুটা আওয়াজও বেরলও, কিন্তু তখন বৃষ্টি নেমেছে জোর, তার উপর বাজের তীব্র আওয়াজ। দম বন্ধ হয়ে এল তার। তাকে জোর করে শুইয়ে দেওয়া হল কাদামাখা মাটিতে। বাঁশঝোপের নিচের ঢালু জমিতে কত লতাপাতা-ঘাস। ছোট্ট মেয়েটি বুঝতে পারছিল না কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে।

চোখে-মুখে দরদর করে জল ঢুকছে। কাঁটাঝোপ বিঁধছে সারা শরীরে। কী অসহ্য যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। মনে হচ্ছে, আর বোধহয় বাঁচবে না। তার উপর এ কে!! মানুষ, ভূত, নাকি জন্তু?

এক সময় ঝড় থামল। মেঘ-ঢাকা কোনও অন্ধকারেই পশুটি মিলিয়ে গেল। স্কুল ড্রেস আর স্কুল ড্রেস নেই। সাদা আর সাদা নেই। সবুজ ওড়না দোমড়ানো-মোচড়ানো ঘাসপাতার সঙ্গে দুমড়ে-মুচড়ে কাদামাটির কোন নিচে চলে গিয়েছে। ফালা ফালা চুড়িদার... সালোয়ার কামিজ।

বহু কষ্টে সে উঠে দাঁড়াল। ডুয়ার্সের নিষ্পাপ মেয়েটি। এই সবুজ পথ দিয়ে প্রতিদিন স্কুল যেতে যেতে তার মন ভাল হয়ে যেত। বাড়ির দারিদ্রযন্ত্রণা, বাবা-দাদার যুদ্ধ, মায়ের কষ্ট— কিছুক্ষণ সব কিছু থেকে মুক্তি। রোজ মেয়েটি সবুজ দেখত, আর ভাবত একদিন পড়াশোনা করে অনেক বড় হয়ে চাকরি করবে। মা হাসবেন। বাবা-দাদা হাসবেন।

অনেক যন্ত্রণায় উঠে দাঁড়াল ক্লাস সেভেনের মেয়েটি। বইখাতা কোথায় গিয়েছে কে জানে। হোমটাস্কের খাতা হয়ত কাদাজলে শেষ। তবু সে উঠে দাঁড়াল। কান্না পেল খুব। ভয় পেতে পেতে এতক্ষণের সব ভয় কোথায় উবে গেল। শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। যন্ত্রণার শেষ সীমা কি এটাই?

কোন দিকে বাড়ি? অনেক কষ্টে রাস্তায় উঠে এল সে। সাইকেলের কথা আর মনেও নেই!

উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাড়ির দিকে এগতে লাগল সপ্তম শ্রেণির বালিকা। নিমেষে যেন তার বয়স কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে।

তখন অঝোর বৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ছিটকে পড়ল তার সাইকেল। ক্লাস সেভেনের ফুটফুটে মেয়েটি বুঝতে পারল না কী হল। তার হাতে আর সাইকেলের হ্যান্ডেল নেই। পা থেকে চটি খসে পড়ল। পিছন থেকে তাকে জাপটে তুলে নিয়েছে কেউ। চিৎকার করতে চাইল, কিছুটা আওয়াজও বেরলও, কিন্তু তখন বৃষ্টি নেমেছে জোর, তার উপর বাজের তীব্র আওয়াজ। দম বন্ধ হয়ে এল তার। তাকে জোর করে শুইয়ে দেওয়া হল কাদামাখা মাটিতে।

বাড়ির উঠোনে দাঁড়াল কন্যা। এইবার হাউহাউ করে কেঁদে ডুকরে উঠল সে। মা চিৎকার করে উঠলেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে। মেয়ে এইবার লুটিয়ে পড়ল উঠোনে।

তারপর হাসপাতাল। পুলিশ। কোর্টে হাজিরা। অনুপুঙ্খ বিবরণ সেই ভয়াল রাতের।

হেড স্যার বিধ্বস্ত জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠলেন, কোনও মানুষ এমন পারে? স্কুল ছুটি দেওয়ার অপরাধবোধে তিনি ককিয়ে উঠলেন ভিতরে ভিতরে। যে মাস্টারমশাই মেয়েটিকে নিতে নিতেও চলে গিয়েছিলেন, দু'চোখে জল নিয়ে ভাবলেন, কেন জোর করলাম না।

কতবার এক কথা তাকে বলতে হল। মাঝে মাঝে নিজেকেই অপরাধী মনে হতে লাগল। মেয়ে হওয়া দোষের?

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতেই হেড স্যার, অন্য স্যার-ম্যাডামরা বারবার তার কাছে এসেছেন। বলেছেন, কিচ্ছু হয়নি, তোকে দাঁড়াতে হবেই। একটা পশুর অন্যায়ে তুই ভাঙবি কেন?

হেড স্যার এসে জোর করে নিয়ে চললেন স্কুলে।— কিচ্ছু হয়নি। তোকে স্কুলে যেতে হবে।

কত লজ্জা নিয়ে জড়সড় হয়ে স্কুলে ঢুকে মেয়েটি দেখল সব স্বাভাবিক। কেউ কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না। বুক টনটন করছে। সবাই তাকে এত ভালবাসে? স্যার এসে আগের মতোই পড়া ধরলেন। টিফিন হলে আগের মতোই প্রিয় বান্ধবী বলল, চল, কিছু খেয়ে আসি।

নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই শুরু হল ডুয়ার্স-কন্যার। পড়ায় মন বসে না। কিন্তু হেড স্যারের কথা কানে ভাসে— পড়তে তোকে হবেই।

বাড়িতে মা পাগলের মতো আচরণ করছে। দাদারা এই ঘটনার পর থেকে কেমন হয়ে গেল। বাবা থানা-আদালতে ছুটতে ছুটতে বিধ্বস্ত। বাড়িতে দারিদ্র ছিল, কিন্তু তার মধ্যেও কোথাও শান্তি ছিল। সব নিমেষে তছনছ। তবু মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে চায়। স্কুলে গেলে তার ভাল লাগে। সবাই তাকে এগতে বলে।

ক্লাস সেভেনের মেয়েটি এভাবেই পৌঁছে গেল মাধ্যমিকের দোরগোড়ায়। ২০১৪-য় ৭৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করল। হেড স্যার মাথায় হাত দিয়ে এমন ভাব করলেন, যেন সে রাজ্যে প্রথম হয়েছে। তার চোখে জল চলে এল। স্যার বললেন, তুই পারবি মেয়ে, একদিন তুই অনেক বড় চাকরি করবি।

বইখাতা তাকে ডাকতে লাগল। পশুটা জামিন পায়নি। কিন্তু মেয়েটির পক্ষে জোরালো চার্জশিট তৈরি হল না। তাই সুবিচারের আশা নেই— সে বড়দের কথায় কথায় আঁচ করে। এফআইআর, কেস ডায়েরি, চার্জশিট... এই শব্দগুলো এ ক'বছরে সে জেনে ফেলেছে।

স্যার বলেন, কিচ্ছু হয়নি মেয়ে। তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

সে সত্যিই ক্রমে নিজেকে নতুন করে শ্রদ্ধা করতে শিখল।

ডুয়ার্সের এই মেয়েটি ২০১৬ সালের উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগে ৮৭.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে চমকে দিল সবাইকে। হেড স্যার যখন রেজাল্ট বলছেন, তাঁর গলা কান্নায় ভিজে যাচ্ছে। মেয়েটি জানে এখন, এ কান্না আনন্দের। মাঠ জুড়ে স্কুলের ভাইবোন-বন্ধুরা তার দিকে তাকিয়ে হাততালি দিচ্ছে। স্কুলের প্রাঙ্গণে থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। তারাও হাওয়ায় দুলছে। হেড স্যারকে প্রণাম করতেই তাঁর দুই হাতে তার দুই গাল, স্যারের তালু ধুয়ে গেল মেয়েটির নোনা জলে।

স্যার আবার বললেন, তুই পারবি, তুইই পারবি।

পথিক বর

বাড়িতে বসে 'এখন ডুয়ার্স' পেতে চান?

এখন ডুয়ার্স-এর পাঠকমহলে সাড়া ও চাহিদা দুই-ই বাড়ছে হু হু করে। এপ্রিল ১, ২০১৬ সংখ্যা থেকে জলপাইগুড়ির সঙ্গে কোচবিহার, মাথাভাঙা, দিনহাটা, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা ও শিলিগুড়ি শহরে বাড়িতে বা অফিসে নিয়মিত 'এখন ডুয়ার্স' পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অন্যান্য এলাকাতেও শুরু হবে এই ব্যবস্থা।

যাঁরা 'এখন ডুয়ার্স' নিয়মিত পেতে চান তাঁরা আজই ফোন করে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নং লিপিবদ্ধ করান। পত্রিকা পৌঁছবে সঠিক সময়ে। পত্রিকার দাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এজেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে। এককালীন বার্ষিক গ্রাহক হয়ে তাৎক্ষণিক দাম দেওয়ার ঝামেলা বিদেয় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২৫০ টাকার বিনিময়ে বার্ষিক গ্রাহক হলে আপনি পাবেন ২৪টি সংখ্যার কুপন। পত্রিকা দিতে আসবেন যিনি তার হাতে কুপনটি ধরিয়ে দিলেই হবে। **গ্রাহক নেওয়া শুরু হচ্ছে মে ১৫, ২০১৬ থেকে।** গ্রাহকদের পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া শুরু হবে জুলাই ১, ২০১৬ সংখ্যা থেকে।

আজই আপনার নাম, ঠিকানা গ্রাহক হিসেবে লিখিয়ে রাখুন। ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

২৬

গগনেন্দ্রর পত্র পেয়ে হিদারু খানিকটা দোটানায় পড়ে গিয়েছে। বাবা মরে যাওয়ার পর থেকে বাড়িটা আর আগের মতো নেই। বিষয়সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে রোজই উকিলের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাই আলোচনায় বসছে। মহাদেব উকিল অনেকদিন ধরেই বাবার বিষয়সম্পত্তির ব্যাপার দেখাশোনা করছিলেন। বয়স্ক মানুষ। হিদারুকে একদিন ডেকে বলেছিলেন, 'শুনলাম তুমি কদমতলার কাছে আলাদা বাড়ি করে চলে যাচ্ছ? তা ভালই করেছ। দাদাদের মধ্যে যে মতান্তর তা মনে হয় এ জন্মে মিটবে না।' কথাটা অতি সত্যি। হিদারু বিলক্ষণ জানে যে সম্পত্তি ভাগের ব্যাপারটা অত সহজে ঘটবে না। মাঝখান থেকে বাড়িতে নিত্যদিন অশান্তি লেগেই থাকবে। তাই একটু ক্ষতি স্বীকার করে আলাদা হয়ে যাওয়াটাই তার পক্ষে ভাল হবে। আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য তার পাওনাগন্ডা কী হবে, তা নিয়ে এর মধ্যেই আলোচনা হওয়ার কথা চলছে। দিন ঠিক হলে মহাদেব উকিল বাড়িতে আসবেন। ফলে গগনেন্দ্রর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামালদহ কি মাথাভাঙা যাওয়াটা তার পক্ষে একটু মুশকিলের।

আবার যেতেও যে ইচ্ছে করছে না এমন নয়। কিন্তু আলিপুরদুয়ার যাওয়ার ব্যাপারটাও রয়েছে। প্রাপ্য সম্পত্তির হিসেবনিকেশ যত তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলা যায়, হিদারুর পক্ষে ততই মঙ্গল। বাইরে যাওয়ার কারণে সে আলোচনা পিছিয়ে গেলে তার অসুবিধা হবে। বউও সেটা চাইছে না। যুদ্ধের পর থেকেই জমির খাজনা বাড়তে শুরু করেছিল। খাজনা মেটাতে না পারার জন্য অনেক জোতদারের জমি সরকারের কাছে আটকে আছে। উপেন বর্মনের মতো লোকের জমিও নাকি আটকে গিয়েছে সেই কারণে। হিদারুর বাবা অবশ্য জোতদারদের মতো সম্পত্তি করতে পারেননি। তবে নগদ টাকা বেশ কিছু জমাতে পেরেছিলেন। চা-বাগানের শেয়ারও পাওয়া গিয়েছে বেশ কিছু। কিন্তু দিনকাল ভাল নয়। জিনিসের দাম আগের মতো সস্তা নেই। টাকায় তিনটে বাঁশ পাওয়া এখন দুষ্কর। হিদারুর বউ তাই বারবার বলছে পাওনাগন্ডার ব্যাপারটা সেরে ফেলতে। এই অবস্থায় গগনেন্দ্রর ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত কি অনুচিত তা নির্ধারণ

করতে হিদারুর একটু সমস্যাই হচ্ছে।

টাউনে প্রতিদিন বিকেলেই কোনও না কোনও সভা হচ্ছে আজকাল। এ ছাড়া প্রদর্শনী, থিয়েটার, যাত্রা— সব কিছুতেই একটা স্বদেশি স্বদেশি ভাব। পুলিশ কড়া নজর রাখছে। সে দিন উকিলপাড়ায় মঞ্চ বেঁধে ছেলেরা 'সিরাজদ্দৌলা' প্লে করল। সেখানেও পুলিশের লোক হাজির। আর্য নাট্য সমাজেও নাকি সেই পালাটার অভিনয় হবে টিকিট দিয়ে। টাকা পাঠানো হবে কংগ্রেস ফান্ডে। কদমতলায় হিদারুর জমির পাশেই নিত্যানন্দ তালুকদারের বাড়ি। পাটের আর তামাকের ব্যবসা করেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। বড় ছেলেটি সদ্য মোক্তারি পাশ দিয়ে টুকটাক কাজ শুরু করেছে। মাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকা রোজগার করে। বেশির ভাগটাই আসে জামিনদার হয়ে। কিন্তু ছোকরার কথাবার্তা বেশ গা-জ্বালানি। কিছুদিন আগে হিদারু জমির আগাছা সাফাই করানোর জন্য এসেছিল। সে এসে আলাপ জমিয়ে যখন হিদারুর বাড়ির প্ল্যান সম্পর্কে জানল, তখন চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, 'অ! বিলিতি কেতায় ড্রয়িং রুম বানিয়ে কংগ্রেস করবেন। তা এই করেই কি ব্রিটিশদের তাড়াবেন আপনারা? বিষয়সম্পত্তি কেমন করেছেন শুনি!'

নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে এসব ভাবছিল হিদারু। কার্তিকের অলস আর ঝিম ধরানো শান্ত দুপুর। সেজদা উঠোনে বসে শোলার কাজ করছিল। তিস্তার চরে শোলা গাছ হয়। সেজদা শোলা জোগাড় করে এনে বাড়ির 'দ্যাও'দের জন্য অলংকার তৈরি করে। কাজটা মন্দ করে না সে। তবে বাইরে কেউ চাইলে করে না। মাঝেমধ্যে দোতারা বাজিয়ে গানও গায়। নবান্নর দেরি নেই। সেজদা শোলা কাটতে কাটতে নিজের মনেই নবান্নর বাজার নিয়ে বকবক করে যাচ্ছিল। বাজারের জন্য এবার নাকি বরাদ্দ পনেরো টাকা। সে টাকায় কী হবে? পাঁচ আনা সের দরে আলু কেনার কী দরকার? আলু একটা খাওয়ার জিনিস হল? সে পয়সায় একটা কবুতর হয়ে যেত! অলস চোখে আকাশ দেখতে দেখতে সেজদার কথা কিছু কিছু শুনেছিল হিদারু। তখনই দেখল কেউ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঘেরা নেই বলে ভিতরের উঠোনের একটা অংশ বাইরে থেকেই দেখা যায়। হিদারু লোকটাকে চিনতে পারল। খুদিদার বাড়ির কাজের লোক।

'বাবু আজ যেতে বলেছেন। আপনার সময় না থাকলে বাবু নিজেই আসবেন বললেন।' হিদারু বাইরে আসতেই বলল লোকটা।

হিদারুর মনে হল বিষয়টা জরুরি। সে বলল, 'আসার দরকার নেই। আমি যাব। এই ছ'টা-সাড়ে ছ'টায়।'

'তবে সন্ধের আগে আগেই পাঠিয়ে দেব। বাবুর তা-ই হুকুম।'

হিদারু এবার সত্যি ঘাবড়ে যায়। তার জন্য খুদিদা গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন— এটা অভাবনীয়! তিনি কি তবে উপেনের কোনও খবর পেয়েছেন? টাউনে বড়রা কাউকে ডেকে পাঠালে যেতে হয়। কিন্তু ছোটদের দেখা করার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনা এই শহরে কেউ শুনেছে?

হিদারু তাই সবিনয়ে গাড়ির ব্যাপারটা ফিরিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেয় যে নিজেই চলে যেতে পারবে। হেঁটে গেলে খুদিদার বাড়ি পৌঁছাতে কতটুকুই বা সময় লাগবে তার! পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে বাড়ি থেকে। দরকারে একটু আগেই চলে যাবে খুদিদার বাড়ি।

তা-ই গেল হিদারু। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সে যখন খুদিদার বাড়ির গলিতে ঢুকছে, তখন বসার ঘরে একটা টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে খুদিদা গভীর চিন্তায় মগ্ন। সামনে একটা ডাকে আসা খাম। ভিতরে থাকা ছোট চিঠিটা খামের পাশেই পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখা। আজ সকালের ডাকেই উপেনের বাবার লেখা চিঠিটা এসেছে কলকাতা থেকে। তারপর থেকে অন্তত বার দশেক সেটা পড়েছেন খুদিদা। চিঠিটা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেটা বারবার পড়ার পর খুদিদা ঠিক করে ফেলেছেন যে, হিদারুর সঙ্গে আজকেই কথা বলবেন। চিঠিতে লেখা ছিল—

'উপেনের সংবাদ লইবার নিমিত্তে আমি মাসকয়েক পূর্বে

নবান্নর দেরি নেই। সেজদা শোলা কাটতে কাটতে নিজের মনেই নবান্নর বাজার নিয়ে বকবক করে যাচ্ছিল। বাজারের জন্য এবার নাকি বরাদ্দ পনেরো টাকা। সে টাকায় কী হবে? পাঁচ আনা সের দরে আলু কেনার কী দরকার? আলু একটা খাওয়ার জিনিস হল? সে পয়সায় একটা কবুতর হয়ে যেত! অলস চোখে আকাশ দেখতে দেখতে সেজদার কথা কিছু কিছু শুনেছিল হিদারু। তখনই দেখল কেউ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঘেরা নেই বলে ভিতরের উঠোনের একটা অংশ বাইরে থেকেই দেখা যায়।

লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মচারীকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের পারিবারিক সুহৃদ। সম্প্রতি তিনি জানাইয়াছেন, গত মাঘ মাসে তিস্তার পূর্ব তটের রথের হাট, আমগুড়ি ইত্যাদি গ্রামগুলিতে এক যুবককে দেখা গিয়াছে। সে যুবক স্থানীয় তারিণী বসুনিয়া নাম্নী কংগ্রেস নেতার গৃহে মাসাধিককাল আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। উহার বিবরণের সহিত উপেনের যথেষ্ট মিল। তারিণীবাবু সম্পর্কে জানিলাম যে, তিনি ব্রিটিশদের চক্ষুশূল এবং তাঁহার বাড়িঘর পুলিশ হস্তী দ্বারা ভগ্ন করিয়াছে তথাপি উঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপেন ইংরেজ বিরোধী কর্মেই লিপ্ত হইয়া কোথাও আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। আপনি পত্রপাঠ অনুসন্ধান করিলে কৃতজ্ঞ থাকি। টাকা প্রয়োজন হইলে জানাইতে সংকোচ করিবেন না। গত মাঘ মাস হইতেই উপেন নিরুদ্দেশ— ইহা স্মরণ রাখিবেন। গগনেন্দ্র নামক এক যুবক তাহার হইয়া টাকা লইতে আসিয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছিলেন। তাহাকে জেরা করবেন। ইতি।'

চিঠি রীতিমতো বিভ্রান্ত করে দিয়েছে খুদিদাকে। তারিণী বসুনিয়া এখনও নিখোঁজ। কিন্তু তিনি কি উপেনকে সঙ্গে নিয়ে আত্মগোপন করেছেন? এটা ঠিক যে গগনেন্দ্র এ বাড়িতে প্রথম এসেছিল উপেনের চিঠি নিয়ে। কলকাতা থেকে তার নামে প্রতি মাসে আসা টাকা গগনেন্দ্রর হাতে দিতে লিখেছিল উপেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর টাকার জন্য উপেনের চিঠি আনেনি সে। জিজ্ঞেস করলে বলেছে যে, উপেনের কোনও সংবাদ আসছে না। উপেনের সঙ্গে তার আলাপ হল কীভাবে? এই প্রশ্নটাও যে খুদিদা করেননি এমন নয়, কিন্তু গগনেন্দ্র ঠিকঠাক কোনও জবাব কি দিয়েছিল? টাউনে সে হিদারুর সঙ্গেই বা ঘুরে বেড়াত কেন? এখানে তার দিদির শ্বশুরবাড়ি। জামাইবাবুর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কি আলাপ হয়নি তার? ওদিকে গোপাল ঘোষ কালকেই জানিয়েছেন যে, গগনেন্দ্রর বাবার চিঠি এসেছে। তাঁর অমত নেই।

'দাদা!'

খুদিদার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল বাইরে থেকে আসা একটা ডাকে। হিদারু এসেছে। তিনি ঝপ করে সোজা হয়ে বসে ডাকলেন, 'হিদারু! ভিতরে এসো বাবা!'

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: সুবল সরকার

দেবপ্রসাদ রায়

১১

প্রবীণ রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত কলাম রাজনীতির কচকচিতে ভরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ট্রেন্ড। অনেক সময় ঠিক তার উল্টোটাও ঘটে। তবে পাঠক উৎসাহিত হতে পারে যদি সেখান থেকে তৎকালীন সমাজ ও পারিপার্শ্বিক ইতিহাসের খুঁটিনাটি মিলে যায়। ডুয়ার্স থেকে দিল্লিতে লেখক জীবনের সময় বিশেষ করে ডুয়ার্স কখনও কখনও কলকাতাও উকিঝুঁকি দিচ্ছে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়েই। কোনও কোনও ঘটনা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। কখনও আবার ঠিক তা না হলেও সেই সময়কালে নির্দিষ্ট কোনও কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিগত শতকের সাত দশকের উত্তাল সময়ের কথাতে ঠিক তেমন একটা ছবি ফুটে উঠছে এই জীবন ধারাভাষ্যে।

কংগ্রেসের হয়ে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— সবই করেছি আমি। সে সময় বক্সিরহাট থেকে বোমার মশলাও এনেছি, আবার দেয়ালও লিখেছি। ১৯৬৯ নাগাদ সুশীল বসু বলে একজন 'জনবাণী' নামে একটা কাগজ বার করতেন। কংগ্রেসি কাগজ। আমি সে কাগজের হকারের কাজও সামলাতাম। 'জনবাণী'র প্যাট্রন ছিলেন এখনকার জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদারের বড়দা দীপকদা। তাঁর একটা চায়ের দোকান ছিল। তিনি বলে দিয়েছিলেন, 'কাগজ আমাকে দিয়ে যেয়ো, আমি পেমেন্ট করে দেব।'

তা, অনুপমদার হয়ে সোনাউল্লায় দেয়াল লিখব বলে কাজ শুরু করলাম। উঁচুতে দেয়াল। আমি মই চেপে লিখতে যাচ্ছিলাম— লোকসভায় সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং বিধানসভায় অনুপম সেনকে ভোট দিন।

ডাক্তারবাবুর নামের জায়গায় এসে সবেমাত্র 'অনু' পর্যন্ত লেখা হয়েছে। এমন সময় কাছেই বেগুনটারি মোড়ের দিক থেকে ভেসে এল সেই ভয়াবহ সমবেত হুংকার, 'মার! মার! মার!'

মানদাক্ষী মই ধরে ছিল। সে চেঁচিয়ে বলল, 'মিঠু, নেমে এসো। মারপিট!' বলেই মানদাক্ষী হাওয়া! কোনও কাজে লাগবে না জেনেও আমি তখন কোমরে একটা বল্লমের ফলা গুঁজে রাখতাম। মইতে চড়েই আমি লক্ষ করলাম প্রচুর লোক নানা দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে। শম্ভুদাকে দেখলাম 'মার' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে দৌড়াতে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তাঁর গতি ছিল বেগুনটারি মোড়ের বদলে উলটো দিকে বাড়ির অভিমুখে! বুঝলাম অচিরেই পালাতে হবে। আমি জলদি মই থেকে নেমে সোনাউল্লার যেদিকে বীরেন স্যারের বাড়ি, তার উলটো দিকের দেয়ালে উঠে ওপাশে লাফিয়ে পড়লাম। কোমরে গোঁজা বর্শার ফলা পেটে প্রায় গেঁথে গিয়েছিল আর কী! আমি পড়েছিলাম একটা বাড়িতে, যেটা খালি ছিল বলে জানতাম। পড়ার সময় একটু সামলে যখন উঠেছি, তখন চোখে পড়ল কালো মাঙ্কি ক্যাপ পরা একটা মাথাও উঠছে। এইবার আমি ভয় পেয়ে বলে উঠলাম, 'কে?'

'আরে মিঠু নাকি?' মাঙ্কি ক্যাপের আড়াল থেকে স্বস্তির স্বর বার হল একটা, 'আমি অমিতদা!'

বুঝলাম পরেশ মিত্রর ছেলে অমিত।

'কিন্তু মিঠু, তুমি পালাও কেন?' অমিতদা এবার বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, 'ওরা তো আমাদের মারছে!'

এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। বেগুনটারি মোড়ের কাছে সেন্ট্রাল গার্লস' স্কুলের দেয়াল লিখছিল বামপন্থীরা। নকশালবাহিনী ওদের আক্রমণ করেছে। এই অবস্থায় ভোট হল। অনুপমদা জিতলেন এবং পিডিএফ সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এল। নকশালদের উপদ্রব পৌঁছাল মধ্যগগনে। পান্ডাপাড়া কলোনিতে একদিন শম্ভুদার জিপটা পুড়িয়ে দিল ওরা। নকশালদের তাণ্ডব কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তার একটা নমুনা দিই। শহরে প্রাণকৃষ্ণ, নরেশ, বাচ্চু পান্ডে, তিলক বাগচি— এরা সব নকশাল হিসেবে সে সময়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল শহরে। সোশালিস্ট পার্টির একজন সদস্য ছিলেন ননী

চক্রবর্তী। ভদ্রলোক বেশ ঠোঁটকাটা স্বভাবের ছিলেন। নকশালদেরও তেড়ে গাল দিতেন কদমতলায় এসে। সোশালিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন তখন শক্তিশালীই ছিল। ওদের ট্রেড ইউনিয়নের নেতা দেবেন সরকার ছিলেন ননীবাবুর নেতা। ননী চক্রবর্তীর ঠোঁটকাটা স্বভাবের একটা ধারণা পাওয়া যাবে দেবেশবাবুর সঙ্গে ওঁর একটা কথোপকথনে। দেবেশবাবু বলছিলেন, 'বুঝলা ননী! আগে চাকরি করতাম। দেখলাম চাকরি আমার জন্য নয়। তখন কিছুদিন ব্যবসা করলাম। তাও জুত পাইলাম না। শেষে এই ট্রেড ইউনিয়নে তোমাদের নিয়া আসি।'

'এখানেই যে রোজগারটা সব চাইতে বেশি, সেইটাও বুঝলেন তা-ই তো?'

ননীবাবুর কথায় একটু রুষ্ট হয়ে দেবেশবাবু বললেন, 'ঠিক কইরা কথা কও! তুমি কি আমারে বাগানের কুলিমজুর ভাবছ?'

'আপনে কি ভাবেন, আমি আপনারে অন্য কিছু ভাবি?'

এই ঠোঁটকাটা ননী চক্রবর্তীকে কলোনিতে নকশালরা হত্যা করল একদিন। হত্যার পর তারা রিভলভারটা ননীবাবুর স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলে এসেছিল লুকিয়ে রাখতে। কারণ, পাড়ায় পুলিশ চিরুনিতল্লাশি করবে সব বাড়িতে। কেবল ননীবাবুর বাড়িটাই বাদ দেবে। ওরা বলেছিল, 'কেবল আপনার বাড়িতেই হবে না মাসিমা, কারণ আপনার স্বামী মারা গিয়েছে।'

জানি না এটা কোন ভাবধারার অঙ্গ ছিল। তবে আমি এসব শুনেছিলাম। সত্যি না-ও হতে পারে।

জিপ দগ্ধ হওয়ার শোকে শম্ভুদা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সুবলদাকে নিয়ে থানা থেকে সিআরপি অফিসারকে ডেকে সোজা হানা দিলেন নতুনপাড়ায় কমলাকান্ত মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। তাঁর ছেলে সুদীপ নাকি নকশাল করে! ঘটনাচক্রে ওই বাড়ির পাশের বাড়িটাই সুবলদার। তাই সংকোচবশত তিনি রুমাল পেঁচিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। শম্ভুদা সেই রুমাল এক টানে খুলে ধমক দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার! মুখ লুকাও কেন?' তারপর সুদীপের কলার ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শালা নকশাল করা হচ্ছে, অ্যাঁ! গাড়ি পুড়িয়েছ! চলো থানায়!'

কমলাকান্তবাবু বললেন, 'এসব আপনি কী করছেন? আপনি কি পুলিশ?' তারপর সুবলদার দিকে ফিরে উচ্চারণ করলেন, 'আপনি আমার পড়শি হয়েও এসব করতে এসেছেন! ছি!'

গাড়ি পোড়ানোর অভিযোগে দু'-তিনজনকে পুলিশ ধরার পর একদিন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের কেউ 'শ্যাডো' করছে। আমরা ছিলাম চারজন। ভয়ে বাড়িতে না ফিরে সোজা ঢুকে গেলাম পার্টি অফিসে। সেখানে সিনিয়ররা সবাই বলছে যে, শম্ভুর উদ্যোগে কয়েকজন গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনাটা আমাদের পক্ষে খারাপই হয়েছে। বরেনদা এসে সব জেনে বললেন, 'ব্যাপারটা ভাল না। তোরা শহর থেকে কেটে পড়।'

প্রায় তখনই গাড়িতে চাপিয়ে পাহারা দিয়ে আমাদের বাগডোগরা পাঠিয়ে দেওয়া হল। তখন কলকাতার বিমানের ভাড়া ছিল আড়াইশো টাকার মতো। বরেনদা নিজেই এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। ফলে আমরা চারজন উড়োজাহাজে চেপে চলে এলাম কলকাতায়। সেখানে সুবলদা চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি, রাতুলদা গেল দিদির বাড়ি এবং আমি আর শেখর গিয়ে উঠলাম সেই মেসটায়। এইসব ঘটল পূর্বোক্ত ইন্দোর সম্মেলনের কিছু আগে।

বিশুও গিয়েছিল ইন্দোরে। সেখান থেকে ফেরার পর মধ্য কলকাতা যুব কংগ্রেসের সভাপতি নারায়ণ কর আমাদের বললেন, 'আমি তো ট্যাক্সি নেব। চলো তোমাদের নামিয়ে দিই।'

তখন খাওয়ার পয়সা নিয়ে টেনশনে থাকতে হত। ট্যাক্সি চড়া ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। আমি আর বিশু চেপে বসলাম। তিনি আমাদের যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন বেলেঘাটায়। সেখানেই ছিল তাঁর বাড়ি।

পরদিন সকাল ন'টার কিছু পরে নারায়ণ কর প্রাণ দিলেন নকশালদের হাতে। সুশীল তখন যুবর রাজ্যস্তরের নেতা। সে হুংকার দিল এই মর্মে যে, বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে হত্যাকারী ধরা না পড়লে পিডিএফ সরকারের পদত্যাগ চাইবে। কয়েক ঘণ্টা পরে যখন নারায়ণ করের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হচ্ছে এনআরএস-এ, তখন তপেশ আচমকা বলল, 'এমন হতে পারে যে এখন আমরা যারা এখানে আছি, কালকে তাদের মধ্যেই কেউ হয়ত নকশালদের হাতে প্রাণ দেবে!'

পরদিন সকালে খবর পেলাম তপেশকে মেরে ফেলেছে নকশালরা। নারায়ণ করের মৃত্যুর তখনও চব্বিশ ঘণ্টাই হয়নি। কিন্তু সুদীপের হুংকারের কারণেই হোক বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলেই হোক— সরকারটা পড়ে গেল ওই বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই। বিজয় সিং নাহার পদত্যাগ করলেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি শাসনের পুনরাবৃত্তি। আবার রাজ্যপাল ধরমবীরার তত্ত্বাবধানে গেল রাজ্য। তারপর সিদ্ধার্থশংকর রায়কে 'পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক মন্ত্রী' হিসেবে কেন্দ্র থেকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হল রাজ্যে। তাঁর অফিস হল রাজভবনে।

এদিকে আমি, শেখর, রাতুলদা আর সুবলদা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছি। দিনের মধ্যে একবার নির্দিষ্ট সময়ে চারমূর্তি জমায়েত হতাম এমএলএ হস্টেলে। জলপাইগুড়িসহ ডুয়ার্সের কিছু বিধায়ক দলের হওয়ায় এই সুবিধা ছিল। আমরা তখন ভাবছি জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু ফিরলেই হবে না। যে গণহত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছিল, তা থেকে আত্মরক্ষার উপযোগী কিছু ব্যবস্থা নিয়ে ফিরতে হবে।

এইখানে জানাই যে, সাতের দশকের রাজনীতি নিয়ে কংগ্রেসের সন্ত্রাস বা সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সন্ত্রাস নিয়ে বামপন্থীরা আজও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হলে দেখা যাবে, অনেক ক্ষেত্রে উলটো ব্যাপারটাই ঘটেছিল। ওই সময়ে বহু সহকর্মী, সহযোদ্ধার মৃতদেহ দেখেছি, যারা নির্মমভাবে খুন হয়েছিল নকশালদের হাতে। আলোচনার কালে বেশির ভাগই এসব অজ্ঞাত কারণে সযত্নে

জিপ দগ্ধ হওয়ার শোকে শম্ভুদা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সুবলদাকে নিয়ে থানা থেকে সিআরপি অফিসারকে ডেকে সোজা হানা দিলেন নতুনপাড়ায় কমলাকান্ত মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। তাঁর ছেলে সুদীপ নাকি নকশাল করে! ঘটনাচক্রে ওই বাড়ির পাশের বাড়িটাই সুবলদার।

এড়িয়ে যান। যথাস্থানে এ বিষয়ে আরও কিছু বলা যাবে।

জলপাইগুড়ির যেসব ব্যক্তি তখন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত, আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করলাম এবার। জানালাম যে 'আমরা আক্রান্ত'। যে কোনও সময়ে যে কেউ 'শ্রেণিশত্রু'র শিরোপায় ভূষিত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারি। আমাদের সহযোগিতা করুন। আত্মরক্ষা জীবের ধর্ম।

শুরু হল কলকাতায় ঘুরে ঘুরে রসদ জোগাড় করা। দু'-আড়াইশো করে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করলেন কয়েকজন। এঁদের মধ্যে যুগল দাগাদের পরিবারের কেউ একজন এবং দীপচাঁদ নাহাটা প্রমুখ ছিলেন। কিন্তু রাতুলদার চাকরি বাঁচানোর ব্যাপার ছিল। সুবলদাও চাকরি করতেন দীপ্তি হলে। ফলে তাঁদের আগেই ফিরে যেতে হল। রসদ সংগ্রহের যাবতীয় দায়িত্ব পড়ল আমার আর শেখরের উপর।

(ক্রমশ)

বই পত্রের ডুয়ার্স

কমলকুমার স্মরণ ও নানা লেখা

প্রচ্ছদে পাই জলপাইগুড়ি দিনবাজারের বেগুনওয়ালি ও ঋত্বিক ঘটকের লেখা অসাধারণ কয়েকটা লাইন। অথচ সংখ্যাটি শতবর্ষে পদার্পিত কমলকুমার মজুমদারের একটি স্মরণ প্রয়াস। হ্যাঁ, সম্পাদক পার্থসারথি লাহিড়ী 'করলাভ্যালি'র দ্বিতীয় সংখ্যাকে কমলকুমার সংখ্যা বলতে চাননি, তবে কমলকুমার মজুমদারকে নিয়ে ভিতরের প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে পত্রিকাকে একটা ওজন এনে দিয়েছে।

গত ২০১৪ ডিসেম্বর 'করলাভ্যালি'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশের পর এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। অত্যন্ত সততার সঙ্গে সম্পাদকের ভালবাসা মিশ্রিত এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে কমলকুমার প্রসঙ্গে প্রবন্ধ, এ ছাড়াও কবিতা, পাঠ প্রতিক্রিয়া ও গদ্য। সব্যসাচী সেনের 'আজকের প্রেক্ষিতে কমলকুমারের 'মল্লিকা বাহার'-এর প্রাসঙ্গিকতা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা। এ ছাড়াও ভাল লেগেছে সুভাষ কর্মকার, শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। সম্পাদকের 'আমার কমলকুমার' একটি যোগ্য প্রবন্ধ, সম্পাদকের দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠক কমলকুমারকে লক্ষ করতে পারবেন। ভাল লাগে বিজয় দে, প্রবীর রায়, সমর রায়চৌধুরী, উমাপদ কর, সব্যসাচী হাজরা, তপেশ দাশগুপ্তর কবিতা।

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গদ্য' নিঃসন্দেহে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে আপনাকে। ভাল লাগে সত্যম ভট্টাচার্য ও দেবাশিস কুণ্ডুর 'আপন কথায়'।

বাড়ির নিজস্ব লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করে রাখবার মতো এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ পেলে আমরা সাহিত্যানুরাগী পাঠকরা উপকৃত হব। পত্রিকার এই সংখ্যার দাম রাখা হয়েছে ১০০ টাকা।

করলাভ্যালি, সম্পাদক পার্থসারথি লাহিড়ী, দাম ১০০ টাকা

সরল কথার গল্প

পেশায় ডাক্তার, নেশায় গল্পকার ডা. উজ্জ্বল আচার্যর ত্রয়োদশ গ্রন্থ 'রংরুট ও অন্যান্য গল্প'। সূচিপত্রে পাই ১৯টি গল্পের নাম। কোনওটি ছোটগল্প, কোনওটি অণুগল্প। প্রতিটিতেই ভেসে ওঠে সমাজের নানা দিক, এবং উজ্জ্বলবাবু নিজে ডাক্তার হওয়ার সুবাদে বেশ কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কলমের বহমানতায়। বেশ কিছু কাহিনির ফাঁকফোকরে লুকিয়ে আছে চিকিৎসকের ব্যক্তিজীবনের বাস্তব-রূঢ় ঘটনা, যাকে অনুভবের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাঁর অপূর্ব শিল্পমহিমায়। কলমের আঁচড়ে ফুটে ওঠে ঝকঝকে প্রাঞ্জল স্বাদু গদ্যের স্বাদ। আর পাঠক খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারেন তার ছোটগল্প-অণুগল্পগুলিতে।

সর্বক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উজ্জ্বলবাবুর গল্পের প্রসাদগুণ অনবদ্য। এই গল্পসংকলনের 'আস্থা' একটি মজার গল্প। বাস্তবসচেতন লেখকের 'স্ক্যান' পাঠককে সচেতন করে তোলে। এক বিরল রোগের গল্প 'অ্যানেনকেফালি'কে জীবনমরণ সমস্যা থেকে নতুন রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। বিভিন্ন ব্যঞ্জনা ও বিশ্লেষণে সাহিত্যসমৃদ্ধ গল্পগুলিতে ছড়িয়ে আছে অনেকটা বিস্তার। লেখক তাঁর সক্রিয় চিন্তাভাবনায় পাঠককে সত্যিই নিয়ে যান রংরুটে। একটা ভাল পাঠ অভিজ্ঞতা হল। বইয়ের বাঁধাইও নজরকাড়া। প্রচ্ছদ করেছেন 'প্রান্তিক অরণ্য'।

রংরুট ও অন্যান্য গল্প, উজ্জ্বল আচার্য, প্রীতম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, দাম ১০০ টাকা

রঙ্গন রায়

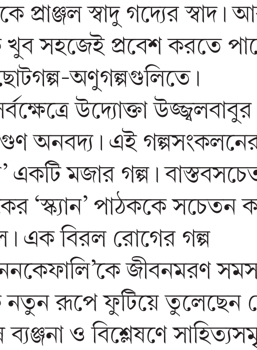

গল্পের ফুলঝুরি

'ফুলঝুরি' দশটি শিশু-কিশোর উপযোগী গল্পসংকলন। সম্পাদনা করেছেন অর্কপ্রভ মিত্র। সংকলনের গল্প দশটি অবশ্য বড়দেরও ভাল লাগবে। কিন্তু কিশোরদের উপযোগী হলেও সংকলনটিকে শিশুপাঠ্য বলা যাবে না। ভূত, রহস্য, রোমাঞ্চের গল্পগুলি কিশোর-কিশোরীরাই বেশি পছন্দ করে।

সংকলনে ডুয়ার্সের পটভূমিকায় চারটি গল্প আছে। রতনতনু ঘাটীর 'জয়ন্তী রেল ব্রিজ' একটি নিপাট ভূতের গল্প। শিশির বিশ্বাসের 'এক রোমহর্ষক রাত্রি' গোয়েন্দা গল্প হলেও শেষের দিকে ভূতুড়ে ছোঁয়া পাওয়া গেল। এ ছাড়াও লিখেছেন জয়দীপ চক্রবর্তী, অনন্যা দাশ, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, রম্যানী গোস্বামী, বিক্রম অধিকারী। এঁদের গল্পগুলিতে কমবেশি ভূত হাজির। সাগরিকা রায়ের 'বাড়ি বড়ো হয়ে যায়' গল্পের হাজারিবাবু এক মজার মানুষ। মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ও মমত্ববোধ হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সব মিলিয়ে ছোটরা নানান স্বাদের দশটি গল্প পাবে এই বইতে।

রূপকথা মিত্রর প্রচ্ছদ আরও একটু আকর্ষণীয় হলে ভাল হত। রুচিরা গুহর ইলাসট্রেশন মন্দ হয়নি। বইটি পেপারব্যাক এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা আটাত্তর।

ফুলঝুরি, সম্পাদনা অর্কপ্রভ মিত্র, 'অমি', শিলিগুড়ি, দাম ১০০ টাকা

নিঝুম ঠাকুর

সাহিত্যিক রণজিৎ দেব প্রণীত

কোচবিহার জেলার ইতিহাস	৩৫০/-
সাহিত্যের ইতিহাসে কোচ রাজদরবার	৩০০/-
উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত	২৫০/-
রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস	২৫০/-
গোসানী মঙ্গল	২৫০/-
কোচ-কামতার ইতিহাস	৩৫০/-
ডুয়ার্সের আদিবাসী জনজাতি	২০০/-
উত্তরবঙ্গের ইতিহাস	৩৫০/-
লোক সাহিত্যে ভাওয়াইয়া গান	৪০০/-
দার্জিলিংয়ের ইতিহাস	১৫০/-
ইতিহাসের আলোকে উত্তরবঙ্গ	২৫০/-
উত্তরবঙ্গের পূজা ব্রত ও উৎসব	২০০/-

ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গের পরিবেশক

বুক ল্যান্ড

সুনীতি রোড, কোচবিহার-৭৩৬১০১

মো: ৯৪৩৪৭০৮৯২০/৯৫৬৪০৫২৭৯৬

অরণ্য মিত্র

৩১

অনেকদিন পর বিজু প্রসাদ বসেছে দাসবাবুর মুখোমুখি। একান্তে। আসলে তাঁদের এভাবে বসার কোনও প্রয়োজন হয়নি। ডুয়ার্স সমেত গোটা রাজ্য এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে এতদিন কাজকর্ম চলছিল স্বাভাবিক ছন্দে। দলগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার জায়গাটা ছিল স্পষ্ট। টুকটাক গোলমাল ছাড়া এমন কিছু ঘটত না যে বিজু প্রসাদকে দাসবাবুর সঙ্গে একান্তে বসতে হবে। কিন্তু হঠাৎ একটা খবর সব এলোমেলো করে দিয়েছে। গত পরশুই বিজু প্রসাদ শিলিগুড়ির একটা সাধারণ বার-এ ডুয়ার্সের অন্ধকার জগতের পাঁচজন নেতার সঙ্গে খবরটা নিয়ে বসেছিল। প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে যে কাজটা তাদের ঘাবড়ে দিয়েছে। যেভাবে প্ল্যান করে সুখান লাকড়া আর চঞ্চল থাপাকে প্রকাশ্যে খুন করা হয়েছে, তা থেকে বোঝাই যায় যে, তারা ইতিমধ্যেই অনেক তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে। সম্ভবত প্রতিটা দলেই ঢুকে আছে ওদের গুপ্তচর। সুতরাং 'ডার্ক ক্যালকাটা'র অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা যথেষ্ট চিন্তার। তবুও উপর থেকে কোনও নির্দেশ না পাওয়ার কারণে বিজু প্রসাদ খানিক আগেও বুঝতে পারেনি যে, স্বয়ং দাসবাবু আলিপুরদুয়ারে নিজেই চলে আসবেন। কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে দিয়ে বেশ অবাকই হয়েছিলেন বিজু প্রসাদ। দাসবাবু ঘরের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বলেছিলেন, 'আমি ঘণ্টাকয়েক হল খবরটা পেয়েছি। দিল্লি এই খবরটায় উদ্‌বিগ্ন।'

তারপর দু'জন বসেছেন মুখোমুখি। বিজু প্রসাদের সামনে একটা ছোট বোতল। দাসবাবুর অবশ্য আগ্রহ নেই ওইসবে।

'সুপারি কিলারকে কন্ট্যাক্ট কে করেছিল বিজু?' দাসবাবু কথা শুরু করলেন। বিজু প্রসাদ দু'পাত্র পান করে ফেলেছে ততক্ষণে। মাথাটা তার হালকা হয়ে যাওয়ায় খুলতে শুরু করেছিল।

'সোনাপুরের কাছে আমাদের যে টার্গেট, তাকে অফ করে দেওয়ার নির্দেশ তো আপনিই দিয়েছিলেন দাসবাবু।' বিজু প্রসাদ মিহি গলায় বলল।

'তোমাকে দায়ী করতে আসিনি বিজু!' দাসবাবু অল্প হাসলেন, 'ব্যাপারটা সিরিয়াস। সুপারি কিলারকে কন্ট্রাক্ট নিশ্চয় তুমি দাওনি?'

'ছোটা কাম ভেবে আমি সুখানকেই বোললাম কোরে দাও। সে বলল একজন এক্স কেএলও আছে। অল্প পয়সায় কোরে দেবে। পল অধিকারীর টিমে ছিল। শার্প শুটার।'

দাসবাবু চুপ করে থাকলেন। গলদটা তিনি ধরতে পারলেন। পল অধিকারীর টিমের যারা ধরা পড়েনি, তারা এদিকে লাল চন্দন চালানের কাজে লিপ্ত। তাদের কেউ সুপারি কিলারের কাজ করবে না। বিজু প্রসাদের উচিত ছিল আরও সাবধান হওয়া। কাজ ছোট কি বড়, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজ হল কাজ। সুখানের কথায় বিশ্বাস করে ফেলাটা বোকামো হয়েছে বিজু প্রসাদের।

'ওই শার্প শুটারের পাত্তা লাগাও।' দাসবাবু মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বললেন।

অ্যাডভান্সের নোটগুলো জাল কিনা মনামী গ্যাজেট মেশিনে পরীক্ষা করে নিল। দুটো খামের মোট দু'শোটা পাঁচশো নোটের মধ্যে একটাও জাল বেরোয়নি। কিন্তু ঋষিকাম প্রোজেক্ট নিয়ে নবীন রাই-এর ফোন যেমন আসেনি, কুমারও আর যোগাযোগ করেনি। তবে অচেনা নম্বর থেকে একটা ফোন পেয়েছে মনামী। নাম সুষমমা। যাকে মনামী চেনেও না, নামও শোনেনি। তবু সুষমার ডাকে তক্ষুনি পৌঁছে গেল সেই কফিশপে। রেড জ্যাকেট পরা সুষমার ফিগার দেখে ওর শরীরের আবেদন মনে মনে তারিফ না করে পারল না মনামী। ওর মতো ব্ল্যাক স্কিনের মেয়েরা ইচ্ছে করলে পর্নো ইন্ডাস্ট্রি কাপিয়ে দিতে পারে।

> সাইটগুলোয় নানান ধরনের পর্নো ভিডিয়ো পাওয়া যায়। সেসব দেখে মনামি নিজের অভিজ্ঞতা বাড়াচ্ছে কিছুদিন হল। সব কাজের পিছনেই যে একটা প্রস্তুতি থাকে, চর্চা করতে হয় এটা মনামি জানত। কিন্তু পর্নো ইন্ডাস্ট্রিতেও যে এই নিয়ম কার্যকর, সেটা সে অনুমান করেনি কখনও।

‘সোনাপুরের টার্গেটটাকে যত তাড়াতাড়ি পারো খতম করো। পারলে কালকেই। ওই ছেলেটাকে কিন্তু আমাদের নতুন বন্ধুরা বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে।’

বিজু প্রসাদ মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল। কাজটা সে একটু কাঁচাই করে ফেলেছে। সুখান লাকড়া মরে গিয়েছে। সেই সুপারি কিলারের ব্যাপারে সে-ই যা জানার জানাত। সেই কিলারের কোনও খবর না রাখার ফল এই মুহূর্তে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বিজু প্রসাদ। কিন্তু আর কিছু করার নেই। সোনাপুরের টার্গেটটাকে যে করেই হোক দু’দিনের মধ্যে নিকেশ করবে বলে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল।

‘মাফি মাংছি দাসবাবু। লেকিন ওই সোনাপুর আমি জলদি নামিয়ে ফেলব।’

‘তারপরেও সমস্যা থাকবে বিজু!’ দাসবাবু হাসলেন একটু, ‘দলের মধ্যে স্পাই ঢুকে গিয়েছে, আমি শিয়োর। স্পাইগুলোকে না পাওয়া পর্যন্ত সব নিজের হাতে রাখবে।’

‘ডার্ক ক্যালকাটা নিয়ে আপনি ঠিক কী জানেন দাসবাবু?’ বিজু প্রসাদের গলায় এবার কিঞ্চিৎ উদ্‌বেগ ফুটল, ‘এরা আমাদের অনিষ্ট কিউঁ কোরবে? এদিকে যারা কামধান্দা কোরছে আমাদের মোতো, আমি তাদের সোবাইকে মিট করলাম। সোবাই কনফিউসড হোয়ে আছে। নোতুন কেউ কামধান্দা সুরু কোরতেই পারে। লেকিন আমাদের টার্গেট কোরবে কেনো?’

‘ডার্ক ক্যালকাটা নিয়ে আমিও খুব একটা কিছু জানি না বিজু প্রসাদ।’ দাসবাবু ম্লান হাসলেন, ‘নামটা শোনা ছিল। তবে সোজা অঙ্কটা সোজাভাবে করো। দেখবে অনেকটাই আন্দাজ করতে পারছ। নর্থ বেঙ্গলে জাল নোট আমদানি ছাড়া ডার্ক ক্যালকাটা আর কিছু করত বলে আমি জানি না। জাল নোট আর লাল চন্দন— এই দুটো ব্যাপারে আমরা এদিকে কোনও ডিল করি না। তাহলে গোলমালটা কোথায়?’

‘ওইটাই তো বোলছি। প্রবলেম কোই?’ বিজু প্রসাদ উরুতে হালকা চাপড় মেরে জানায়।

‘আমাদের থাকাটাই তো প্রবলেম বিজু!’ দাসবাবু উঠলেন, ‘পেটে মদ পড়লে তোমার কনফিডেন্স বেড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিটা কমে যায়। ওরা আমাদের মারতে চায়। তারপর ফাঁকা মাঠে গোটা নর্থ বেঙ্গল আর নর্থ-ইস্টে গোল দিয়ে বেড়াবে। মনে রেখো, আমরা কিন্তু দু’জন ভাল সঙ্গীকে হারালাম।’

বক্তব্যটা পেশ করে আর দাঁড়ালেন না দাসবাবু। বিজু প্রসাদ আরও কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থাকল চেয়ারে। সোজা অঙ্কটা সোজাভাবে এবার সে কষতে পারছে। বিপক্ষ তাদের শেষ করে দিতে চায়। এতদিন এই ভাবনাটা অসম্ভব মনে হত বিজু প্রসাদের কাছে। সে জানত যে, ডুয়ার্স আর নর্থ-ইস্টের কালো দুনিয়ায় তাদের কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না। দাসবাবু সেই অহংকারে একটা আঘাত করে গেলেন। তিনি ভুল বলেন না। দলের দু’জন পুরনো লোককে এভাবে, এত সহজে খুন করে ডার্ক ক্যালকাটা যে বার্তা দিয়েছে, এতক্ষণে তার তাৎপর্য অক্ষরে অক্ষরে অনুভব করতে পারছিল বিজু প্রসাদ।

এ ছাড়াও আরও একটা ভয়ংকর ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন দাসবাবু, দলে স্পাই ঢুকেছে।

৩২

কফি শপ থেকে বাড়িতে ফিরে মনামি অনেকক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। তাদের বাড়িতে একটা জাল নোট শনাক্ত করার গ্যাজেট আছে। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মনামি নোটগুলো পরীক্ষা করেছিল একটা একটা করে। দুটো খামের মোট দু’শোটা পাঁচশো টাকার নোটের একটাও জাল বার হয়নি। তার মানে নগদ এক লক্ষ টাকা তার হাতে! কফি শপ থেকে বার হওয়ার সময় লোকটা নিজের নাম বলেছিল ‘কুমার’। নবীন রাইয়ের ফোন না ধরার কথাটাও আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছিল সে। মনামি এটা নিয়ে কিঞ্চিৎ দোটানায় ছিল অবশ্য। কিন্তু নবীন রাইয়ের ফোনই আর আসেনি। হোটেলে ‘ঋষিকাম’ নিয়ে মিটিংটা হঠাৎ করে ভেস্তে যাওয়ার পিছনে কী কারণ ছিল, তা মনামি তখন ভাবতে যায়নি। কিন্তু এবার নবীন রাইয়ের ফোন আর না আসায় সে অনুমান করল, এর পিছনে কুমারদের দলের কোনও হাত রয়েছে। কুমার কোনও ফোন নাম্বার দিয়ে যায়নি তাকে। কেবল বলে গিয়েছে যে, খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে নেবে।

টাকাগুলো নিজের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়ে মনামি ল্যাপটপটা নিয়ে বসে ছিল। বেশ খানিকটা বিদেশি পর্নো সাইটের সদস্য হয়েছে সে। এ দেশ থেকে সেসব সাইটের সদস্য হওয়া সম্ভব নয়। চাঁদা দিতে হয়েছে ডলারে। নবীন রাই তার মার্কিন এজেন্টকে নিয়ে সে দেশ থেকে মনামিকে সদস্য করিয়েছে। সাইটগুলোয় নানান অভিনব ধরনের পর্নো ভিডিয়ো পাওয়া যায়। সেসব দেখে মনামি নিজের অভিজ্ঞতা বাড়াচ্ছে কিছুদিন হল। সব কাজের পিছনেই যে একটা প্রস্তুতি থাকে, চর্চা করতে হয়— এটা মনামি জানত। কিন্তু পর্নো ইন্ডাস্ট্রিতেও যে এই নিয়ম কার্যকর, সেটা সে অনুমান করেনি কখনও।

কিন্তু ল্যাপটপ খুলে মনামি তার চর্চায় খুব একটা মন দিতে পারছিল না। নবীন রাইয়ের মতো পর্নো প্রোডিউসারের হাত থেকে একটা প্রজেক্ট হাইজ্যাক করে কুমার কি সফল হবে? এটা কোনও ষড়যন্ত্র নয় তো? নবীন রাইও ছেড়ে কথা বলবে? মাঝখান থেকে মনামির ফেঁসে যাওয়ার চান্সই বা কতটুকু?

প্রশ্নগুলো নিজের মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে মনামি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না। কুমার এক লক্ষ টাকা আগাম দিয়ে গিয়েছে। টাকাটা সে না নিলেও পারত। কুমার এর পর ফোন করলে টাকাটা কি ফেরত দিয়ে দেবে? মনামি ভাবছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এল যে, টাকা ফেরত দেওয়াটা বোকামি হবে। এমন তো নয় যে, নবীন রাইয়ের সঙ্গে কাজ করছে বলে সে অন্য কোনও প্রোডিউসারের সঙ্গে কাজ করবে না। সব ইন্ডাস্ট্রিতেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে জব্দ করার একটা ব্যাপার থাকে। নিশ্চয় নবীন রাইয়ের লোককে টাকা খাইয়ে কুমার নামের লোকটা ঋষিকাম প্রজেক্ট-এর ডিটেইল পেয়ে গিয়েছে। মনামি তো নবীন রাইয়ের সঙ্গে কোনও চুক্তি করেনি। এবার মনামি অস্বস্তিটা অনেকটাই কাটিয়ে ফেলতে পারল। সন্ধে হয়ে আসছে। মা-বাবা দু’জনেই এখন বাইরে। অবশ্য এটাই অধিকাংশ দিনের রুটিন। বিশাল এই ফ্ল্যাটটায় মনামি তার জীবদ্দশার বড় অংশটাই একা কাটিয়েছে। কাজের লোক থাকলেও মনামি খুব দরকার ছাড়া তাদের ডাকে না। তার কোনও বান্ধবীও নেই গল্প করার মতো। আসলে সে নিজেই কোনও বান্ধবীকে কাছে আসতে দেয়নি। পরিচিত সব মেয়ের মধ্যেই সে শরীর নিয়ে সংস্কারের বাঁধন অনুভব করেছে। তার কাছে নবীন রাইয়ের স্টুডিয়োতে তোলা নিজের যে ভিডিয়োগুলো আছে, তার যে কোনও একটা দেখলেই অধিকাংশ মেয়ের চোখে সে ‘নষ্ট’ হয়ে যাবে।

কফি বানাবে বলে মনামি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কিচেনের দিকে এগচ্ছিল। তখন ফোন এল একটা। অচেনা নম্বর। মনামি ফোনটা ধরতেই উলটো দিকে একটা মেয়ের গলা পেল— ‘মনামি বলছ?’

‘আপনি কে?’ মনামি সতর্ক গলায়

জানতে চায়।

'আমার নাম সুষমা। চিনবে না। আমরা বোধহয় একই বয়সি।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'কথা আছে। আমি শিলিগুড়িতেই আছি। চাইলে আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখা হতে পারে।'

'আমি কিন্তু লেসবিয়ান নই।'

মনামির কথায় সুষমার গলায় হাসি শোনা গেল। সে বলল, 'আমিও না। কিন্তু কথা বলাটা জরুরি।'

'কোথায়?'

'সেই কফি শপে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে মনামি বলল, 'ডান।'

'আমার গায়ে একটা লাল জ্যাকেট থাকবে।'

আধ ঘণ্টা খুব একটা সময় নয়। মনামি কফি বানাবার প্ল্যান বাতিল করে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। সুষমা নামের সেই মেয়েটি যখন 'সেই কফি শপ' কথাটি বলেছে, তার মানে কুমারদের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। এটা ভাবতেই বেশ উত্তেজনা হচ্ছিল মনামির। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সে বেশ দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল কফি শপের দিকে। রাস্তা রীতিমতো জমজমাট। কফি শপের সামনে এসে মনামি দাঁড়াল। আধ ঘণ্টা হতে এখনও মিনিট পাঁচেক আছে। মনামি এদিক-ওদিক তাকাতেই লাল জ্যাকেট পরা একটা মেয়েকে দেখতে পেল। তার এগিয়ে আসা দেখে মনামি বুঝল যে সে তাকে চেনে।

'আমি সুষমা।'

প্রায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা মেয়েটির শরীরের কাঠামো টুকটুকে লাল জ্যাকেট আর কালো প্যান্ট ছাপিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। গায়ের রং কালোর দিকে। পানপাতার মতো মুখ আর বড় বড় চোখ।

'আমি মনামি। গ্লাড টু মিট ইউ।'

'চলো, ভিতরে যাই।'

'চলো।'

মনে মনে সুষমার আবেদনের প্রশংসা করতে করতে কফি শপের ভিতরে ঢুকল মনামি। এই ধরনের ব্ল্যাক স্কিনের মেয়েরা ইচ্ছে করলেই পর্নো ইন্ডাস্ট্রি কাঁপিয়ে দেবে।

৩৩

জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া তিস্তা নদীর পশ্চিম পাড়ের অনেকটা অংশ দখল করে যে জনবসতি গজিয়ে উঠেছিল, সেটা নাকি পঞ্চায়েত হয়ে গিয়েছে। বর্ষায় প্রকৃতির নিয়মে যখন তিস্তা ভরে ওঠে, তখন সেই এলাকা ডুবে যায় আর সংবাদমাধ্যমে তা প্রচারিত হয় 'বন্যা' বলে। তিস্তার ঠিক পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া করলা নদীর ক্ষেত্রেও একই কথা। সেখানেও নদী দখল করে বসতি এবং তার আবার সরকারি নামও আছে। সুরেশ কুমার গত পনেরো বছর ডুয়ার্সের অলিগলি- পাকস্থলী ঘুরে বেড়িয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার আর কোচবিহার— এই তিনটে জেলা হাতের তালুর মতো চেনে সে। জলপাইগুড়ি শহরে তিস্তার চরে বস্তি এলাকায় একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এই মুহূর্তে সে জুবিলি পার্ক লাগোয়া বাঁধে একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে আছে।

সুরেশ কুমারকে কিছুদিন আগে দেখা গিয়েছে দীননাথ চৌহানের সঙ্গে আলাপ করতে। শিলিগুড়িতে একটা কফি শপে মনামির হাতে আগাম এক লক্ষ টাকা সে-ই ধরিয়ে দিয়েছিল। তাকে দেখলে খুব সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়। পোশাক-পরিচ্ছদেও কোনও বাহুল্য নেই। অথচ মুহূর্তের মধ্যে রিভলভার বার করে নির্ভুল লক্ষ্যে বুলেটের আওতায় থাকা কোনও ব্যক্তির মাথায় গুলি ঢুকিয়ে দিতে তার মতো ওস্তাদ খুব কমই আছে। দাসবাবুদের 'দিল্লি এক্স'-এর ঘুম ছুটিয়ে দেওয়ার মতো নেটওয়ার্ক ডুয়ার্স সমেত গোটা নর্থ-ইস্টে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও তার জুড়ি পাওয়া যাবে না। তার জগতে সে পরিচিত 'কুমার' নামে।

সকাল আটটা নাগাদ তিস্তার পাড়ে জুবিলি পার্কে এসেছে সুরেশ কুমার। সুখান লাকড়া আর চঞ্চল থাপাকে মারার পর জুবিন লিংডো তিস্তা নদীর এই বস্তিতেই আশ্রয় নিয়েছে। এবার তাকে ডিব্রুগড় পৌঁছে দিতে হবে। দাসবাবুর লোকজনদের গতিবিধির অনেক তথ্যই এখন সুরেশ কুমারের হাতে। শুধু দীননাথ নামের ছেলেটার কাছ থেকে আসা তথ্যটাই একটু বিভ্রান্ত করে রেখেছে তাকে। সুষমা বলে একটা মেয়ে কিছুদিন হল 'দিল্লি এক্স'-এর হয়ে কাজ করছে এদিকে। শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ীকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণও আদায় করেছে ভাল অঙ্কের। কিডন্যাপের ব্যাপারে সুষমার ভূমিকা ছিল সাংঘাতিক। কিন্তু সুষমাকে সুরেশ কুমারের লোকজন এখনও শনাক্ত করতে পারেনি। মাসখানেক আগে কয়েকটা ফোটোগ্রাফ পাঠানো হয়েছিল উপরমহল থেকে। বলা হয়েছিল যে, ছবিগুলোর প্রত্যেকটাই 'দিল্লি এক্স'-এর হয়ে ডুয়ার্সে কাজ করা লোকজনের ফোটো। প্রত্যেকেই বেশ এফিশিয়েন্ট। এদের দলে টানতে হবে। ফোটোগুলোর মধ্যে মেয়ের ছবি একটাই ছিল। সুরেশ কুমার নিশ্চিত ছিল যে, সেটাই সুষমার ছবি। কিন্তু দীননাথ চৌহান জানিয়েছে যে, সেটা কন্যাসাথি নামে এক এনজিও-র ম্যাডামের ছবি।

ফলে সুরেশ কুমার একটু হলেও বিভ্রান্ত হয়েছে। 'দিল্লি এক্স'-এর একটা গোপন সাইট আছে। 'গুগ্‌ল' সার্চে সেটা ধরা পড়ে না। মাত্র কয়েকজন সেই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারে। সেই সাইট হ্যাক করার পর দাসবাবুদের অনেক তথ্যই হাতে চলে এসেছে। অবশ্য অনেক তথ্যের 'কোড' এখনও ভাঙা যায়নি। ফোটোগুলো সেই সাইট থেকেই হ্যাক করা। ফোটোর সঙ্গে পরিচয় সংক্রান্ত যে তথ্য ছিল, তা কোড না জানায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলেই উপরমহল থেকে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুরেশ কুমারের কাছে। কাকে সম্ভাব্য কোন লোকেশনে পাওয়া যেতে পারে, সে ইঙ্গিতও ছিল। কিন্তু সেসব ছবির মধ্যে এনজিও-র ম্যাডাম এল কোত্থেকে?

তিস্তার পাড়ে শীতের নরম সকালে বসে সুরেশ কুমার বিভ্রান্তিটা কাটানোর চেষ্টা করছিল। যদি সত্যিই মেয়ের ফোটোটা লাবনি দাসের হয়, তবে সুষমার কোনও ফোটো তাদের কাছে নেই। সে ক্ষেত্রে কন্যাসাথি এনজিও নিয়ে একটু মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে বইকি! দীননাথের কাছে দ্বিতীয় যে ফোটোটা দেওয়া আছে, তার নাম হওয়া উচিত বিজু প্রসাদ। এখনও সে ফোটোর বিষয়ে কোনও খবর আসেনি।

সাড়ে আটটা নাগাদ ধর্মেশ এল। এর জন্যই অপেক্ষা করছিল সুরেশ কুমার। ধর্মেশের তত্ত্বাবধানেই জুবিন লিংডো এখানে আছে। দাসবাবুর লোকজনদের সঙ্গে কিছু কিছু কাজ করেছে ধর্মেশ। কাজের টোপ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কমবয়সি মেয়েদের এপারে নিয়ে আসার ব্যাপারে ধর্মেশের যোগাযোগ খারাপ নয়। ইদানীং অবশ্য ধর্মেশ সুরেশ কুমারের হয়ে গুপ্তচরগিরি চালাচ্ছে। সোনাপুরের একটা ছেলেকে মারার জন্য সুখান লাকড়া যখন কম পয়সায় কাউকে খুঁজছিল, তখন জুবিনের নামটা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল ধর্মেশই। সুরেশ কুমার ঠিক করেছিল যে, সোনাপুরের ছেলেটাকে তুলে এনে প্রোটেকশন দেওয়ার দায়িত্বটা ধর্মেশকেই দেবে। ধর্মেশ দায়িত্বটা পেয়ে প্ল্যান সেরে রেখেছিল। দাসবাবুদের দুই পুরনো সঙ্গীদের খতম করার পর জুবিন যখন ওদের গাড়িটা নিয়ে পালাচ্ছিল, তখন ধর্মেশ ছেলেটাকে ফোন করে ফালাকাটায় ডাকিয়ে এনেছে। এই মুহূর্তে সে ধর্মেশের তত্ত্বাবধানেই কোথাও আছে।

'আপনি বললেই জুবিনকে বার করে নিয়ে যাব।' সুরেশ কুমারের পাশে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে ধর্মেশ বলল, 'বিজু প্রসাদ নিজে পরশু সোনাপুর গিয়েছিল। ছেলেটাকে মারার জন্য ওরা এবার খেপে উঠেছে।'

'ছেলেটা আমাদের মোক্ষম অস্ত্র।' সুরেশ কুমার বলল, 'কন্যাসাথি বলে কোনও এনজিও-র নাম শুনেছ তুমি?'

'কন্যাসাথি? কই, না তো!'

সুরেশ কুমার এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না। *(ক্রমশ)*

বক্সা হোম স্টে

ভোট মিটতে না মিটতেই উত্তরবঙ্গে যাত্রীর ঢল। নিরানব্বই শতাংশ পাহাড়মুখী। দার্জিলিং ম্যালে পা রাখার জায়গা নেই। হোটেল রিসর্ট হোম স্টে সব খচাখচ ভরতি। জলপাইগুড়ির এক বন্ধুকে ফোন করলাম, ভাই গিন্নি রেগে টং, খাওয়া-দাওয়ায় হরতাল, না বেরোলেই নয়। কোথাও একটা ব্যবস্থা করো। ট্রেনের টিকিট না পেলে নিজের পুরনো চারচাকা বাহনটাকেই না হয় সারিয়ে টারিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, কিন্তু থাকার জায়গা ভাল আর নিরিবিলি না হলেই নয়। অন্যান্য অনেকবারের মতই এই বিপদেও উদ্ধার করল বন্ধু। রাতে বাড়ি ফিরতেই ফোন। বক্সার বাঘবনের ভেতর দুর্দান্ত এক হোম স্টে-তে দুটো ঘর পাওয়া গিয়েছে। দিন কয়েকের জন্য ওখানেই বডি ফেলে দাও। সংসারটা বোধহয় এ যাত্রায় বেঁচে গেল।

তৎকালে মারপিট করে গরীব রথের চারটে টিকিট পেলাম। নিউ আলিপুর ট্রেন পৌঁছল বেলা এগারোটা নাগাদ। স্টেশন থেকে একটা বড়সড় অটোরিক্সা আমাদের তুলে নিয়ে চলল পঙ্খিরাজের মতো। বহুদিন আগে আসা আলিপুরদুয়ার জংশন দেখে চিনতে পারলাম। খানিক পরেই রাজাভাতখাওয়া গেট। এ সময় ডুয়ার্স জুড়ে বর্ষার পরিবেশ। গাছেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে কে কত সবুজ হয়ে সেজে উঠতে পারে। এ পথে হাতিদের ছানাপোনা নিয়ে পার হতে দেখা যায় হামেশাই। তাদের দেখা না পেলেও বাইকে চেপে লম্বা লম্বা লেন্সধারী কিছু নব্য ক্যামেরাবাহী (নিশ্চয়ই সব ফটোগ্রাফার) চোখে পড়ল।

খানিক এগিয়ে ডান হাতে বড়সড় এক ওয়াচটাওয়ার তৈরি হচ্ছে। আরও এগিয়ে ডান হাতে পথ

চলে গিয়েছে জয়ন্তীর দিকে। আমরা এগিয়ে গেলাম সোজা। ব্যাস, বাঁ হাতে বিশাল ক্ষেতের মধ্যে এক অসাধারণ বাংলো বাড়ি।

কাঠের প্ল্যাংকিং করা। মন ভরে গেল, বউয়ের মুখে এবার সত্যিকারের হাসি দেখে। ছেলেমেয়ে দু'জনেই উল্লাসে ফেটে পড়ল।

স্থানীয় মানুষ দুর্গা অধিকারীর বাড়ি। এখন ডুয়ার্সের অন্যতম সেরা হোম স্টে। বহু পর্যটককে এর আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে লেপচাখা-আদমা-রূপমভ্যালির পায়ে হাঁটা অ্যাডভেঞ্চার পথে। এখনও বললে এক পায়ে খাড়া। আমার সঙ্গে আসা বাক্সপ্যাঁটরা সব খুলে ফেললাম— যেন মাসখানেকের জন্য আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। বললাম, ভাই একটা বা দুটো সাইকেল যোগাড় করে দিতে পারো? ভোরবেলায় তা হলে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম ইতিউতি। জঙ্গলে এসে আমাদের মতো শহুরে জীবগুলির চোখেমুখে তখন সত্যিকারের মুক্তির আনন্দ।

থাকার জন্য মোট তিনটে ঘর। একটা বিশাল কাঠের বারান্দায় চেয়ার পেতে দিনরাত বসে কাটিয়ে দেওয়া যায়, কোথাও না গেলেও চলে। কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই, তবু শহরের অভ্যেস, সকাল হলেই বায়নাক্কা চলো বেরিয়ে পড়ি। বিকেল হতেই ঘ্যানঘ্যান, দূর এভাবে ঘরে বসে থাকতে ভাল্লাগে না। নিমরাজি হয়েও ওদের সঙ্গে ক'টাদিন খুব ঘুরে বেরিয়েছি। এদিকে বক্সাফোর্ট, ওদিকে জয়ন্তী পেরিয়ে ফাসখাওয়া রহিমাবাদ চা-বাগানের মধ্য দিয়ে তুরতুরি হয়ে ভুটানঘাট। এ সময় ডুয়ার্সের তাপমান ১৮-২২ ডিগ্রি, রোজ রাতে বৃষ্টি হয়, বিশেষ করে দিনের বেলা যদি খানিক রোদ ওঠে গরম লাগে তো কথাই নেই, সন্ধে হলেই ঝমঝম বারিধারা। ফ্যান তো দূরের কথা, গায়ে চাদর দিলে আরামের ঘুম। এইখানে বসে বর্ষাকালের ডুয়ার্স দেখার সৌভাগ্য হয়ত হবে না, কারণ জঙ্গলে প্রবেশ সে সময় নিষিদ্ধ। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে এলে বর্ষায় ডুয়ার্সের রূপ কতটা মোহিনী হয় তা দেখা হয়ে যাবে।

বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬০৭৭২০২ (কলকাতা), ৯৭৩৩৪৫৪৭৭৯ (ডুয়ার্স)।

ক্ষুদিরাম প্রামাণিক

LIC
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
১২ বছরের বিশ্বস্ত নাম

Arajit Lahiri (Raja)
Zonal Manager Club Member for Agent

Contact for Free Consultancy & Servicing
- LICI Agent
- Housing Finance Ltd. Agent
- Mortgage Loan
- Premium Deposit
- NEFT Registration
- Nominee Changes
- All Type of Loan

সারা বছর আপনাদের সঙ্গে

9932103350, 9832452859
arajit45@gmail.com

এবার পুজোর ছুটিতে উত্তরবঙ্গ থেকে কেরালা বেড়াতে চলুন
মোট ১৫ দিনের সফর
সামান্য কয়েকটি আসন খালি রয়েছে

07/10/16 Day 1: Start from NCB/NJP
08/10/16 Day2: In train
09/10/16 Day 3: Arrive at Kochi. Overnight hotel
10/10/16 Day 4: COCHIN
11/10/16 Day 5: MUNNAR
12/10/16 Day 6: MUNNAR
13/10/16 Day 7: THEKKADY
14/10/16 Day 8: ALLEPPEY (House boat cost Extra)
15/10/16 Day 9: KOVALAM
16/10/16 Day 10: Kovalam-Trivandram-Kovalam
17/10/16 Day 11: KANYAKUMARI
18/10/16 Day12: Trivandram Central for train
19/10/16 Day13:Train
20/10/16 DAY14: NJP/NCB. Tour Ends

HOLiDAYAAR
শিলিগুড়ি অফিস : হরেন মুখার্জি রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
Ph. : 0353-2527028 / 9735095957
E-mail : holidayaar.nb@gmail.com
দিনহাটা অফিস : শিতলাবাড়ী রোড, ওয়ার্ড নং-৫, দিনহাটা, কোচবিহার
M : 9434042969 / 9434442866

খেলাধুলায় ডুয়ার্স

জলপাইগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার এক সোনালি স্বপ্ন

শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম বা বর্ষা, যদি কাকভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারেন তাহলে জলপাইগুড়ির বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে একবার চলে আসতে পারেন। চোখ থেকে ঘুমের কুয়াশা তাড়াতে তাড়াতে দেখতে পাবেন শ'দেড়েক ছেলে একাগ্র চিত্তে ক্রিকেটের অনুশীলন করে চলেছে। কেউ ব্যাট করছে, কেউ বল, কেউ ফিল্ডিং। দেড়শো কচিকাঁচার কলতানে মুখরিত হয়ে উঠছে জলপাইগুড়ির ভোর। আরও একটু খেয়াল করলে দেখবেন, তাদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করছি, অনুশীলন করছি ও করাচ্ছি আমি, খুদেগুলোর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব যার কাঁধে।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা— এই ক্রিকেট কোচিং সেন্টার যে গড়ে উঠেছিল, সেই কৃতিত্বের সিংহভাগ সেই সময়ের জেনারেল সেক্রেটারি অঞ্জন সেনগুপ্তর, যিনি সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। নিজে অল্পবিস্তর ক্রিকেট খেলেছি ঠিকই, কিন্তু ২০১১-১২ সালে তাপস ঘোষের সঙ্গে যখন আমাকে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট কোচিং-এর দায়িত্ব দিয়েছিলেন অঞ্জনদা, তখন সেই শুরুর দিনগুলোতে চূড়ান্ত নার্ভাস ছিলাম।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর উদ্যোগে সারা বাংলা ক্রিকেট কোচদের নিয়ে একটা কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সঙ্গে 'ও' লেভেল ক্রিকেট কোচিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করা হয়। ওই ট্রেনিং করিয়েছিলেন বিসিসিআই এবং ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি সত্রাজিৎ লাহিড়ি এবং বিসিসিআই- এর লেভেল 'বি' কোচ রাজীব দত্ত।

শুরুর দিকে আমরা খুব নার্ভাস ছিলাম। তার কারণও ছিল। রোজ ভোরবেলা আমরা মাঠে আসছি, কিন্তু স্টুডেন্ট সেভাবে আসছে না। দু'-একজন ছেলে শুধু আসছে মাঠে। মনে আছে, তখন অঞ্জন সেনগুপ্ত আশ্বাস দিয়ে বললেন, একটু ধৈর্য ধরে মাঠে পড়ে থাক। হাল ছাড়িস না। দেখবি একদিন এই ক্যাম্পে অনেক স্টুডেন্ট হবে। সত্যিই তা-ই। অঞ্জনদার কথাই সত্যি প্রমাণিত হল। ধীরে ধীরে ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে একজন-দু'জন করে স্টুডেন্ট আসতে শুরু করল। খুব তাড়াতাড়ি একশো ছাড়িয়ে গেল সেই সংখ্যা।

প্রতিকূলতা ছিল অনেক। তবুও আমরা এই ক্যাম্প এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একদিন আমার পার্টনার তাপস ঘোষ চাকরিসূত্রে কলকাতায় বদলি হয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম আমার একার পক্ষে এই ক্যাম্প চালানো সম্ভব হবে না। কিন্তু অঞ্জন সেনগুপ্ত আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, এত সহজে হাল ছাড়িস না। নিজের উপর ভরসা রাখ। তুই আসাম রাজ্য দলের হয়ে আন্ডার সিক্সটিন বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি খেলেছিস, সিএবি-র 'ও' লেভেল কোচের কোর্স করে এসেছিস, তুই জলপাইগুড়ি সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট দলের নিয়মিত সদস্য, তুই না পারলে কে পারবে!

অঞ্জনদার কথায় আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ল। ভাবলাম, দেখাই যাক না কী হয়। ক্রিকেট নিয়ে লেগে থেকে থেকেই আজ আমাদের এই কোচিং সেন্টার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে অনেক প্রতিভাবান ছেলে উঠে আসছে। বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে সুনামের সঙ্গে। জেলা দলেও সুযোগ পাচ্ছে। কলকাতা লিগেও খেলছে কেউ কেউ। এমনকি বাংলা ক্রিকেট দলেও ট্রায়াল দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ও নামী ক্রিকেট কোচ ডেভ হোয়াটমোরের মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে। ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন আমাদের কোচিং সেন্টার দেখে। তবে একটা কথা বলতেই হবে যে, সামগ্রিক চিত্রটা পুরোপুরি যে সুখকর তা নয়। কোচিং ক্যাম্প চালানোর কিছু ব্যাবহারিক অসুবিধাও আছে। এই ক্যাম্পে যেসব ছেলে আসে, তারা গরিব পরিবারের। তাদের উৎসাহ বা পরিশ্রম করার মানসিকতার ঘাটতি নেই। কিন্তু অপুষ্টিতে ভোগা এই ছেলেদের জন্য কষ্ট হয়। ক্রিকেট খেলার জন্য যে সরঞ্জাম দরকার হয় তা কেনার মতো সাধ্য এদের নেই। কলকাতায় গিয়ে প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয় অর্থের অভাবে। এই অভাব যদি পূরণ করা যায় তাহলে এদের মধ্যে থেকেই ভবিষ্যতের সৌরভ, শচীন বা ঋদ্ধিমান উঠে আসবে। জলপাইগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার থেকে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা দলে কেউ না কেউ সুযোগ পাবে— এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই যে প্রতিদিন নিয়ম করে ভোরবেলা ক্রিকেট মাঠে ছুটছি, সেই সোনালি স্বপ্নটাই আমার আসল মোটিভেশন।

উদয় রায়

বাংলাদেশ সফরে ডুয়ার্সের ক্রিকেট দল

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচনী ফলাফলের পরেই আলিপুরদুয়ার ভেটারেন্স ক্লাবের একটি ক্রিকেট দল সৌজন্য সফরে যাচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের ন্যাশনাল ক্রিকেট আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে সারা দিয়ে সেখানে বেশ কয়েকটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলবে আলিপুরদুয়ারের ভেটারেন্স ক্রিকেট দল। ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের রাজধানি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ আরও বেশ কিছু জায়গায়। ডুয়ার্সের সোনালি অতীতে বেশ কিছু

খ্যাতনামা ক্রিকেটার এই সৌজন্য সফরে খেলতে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের জাতীয় দলের বেশ কিছু ক্রিকেটারও এই প্রীতি ম্যাচগুলোতে অংশ নেবে। ডুয়ার্সের এই দলটি আগামী ৫ জুন ফিরে আসবে। ঢাকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠেও বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলবে দলটি। আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাবের মাঠে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্রতিদিন হচ্ছে অনুশীলন। অনুশীলন দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় করছেন মাঠে। প্রায় ১৫ বছর আগে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার সিনিয়র ক্রিকেট দলটি রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই দলের তিন জন সদস্য— সোমশঙ্কর দত্ত, অসীম গুহ, সুমন্দ্র দে যেমন রয়েছেন দলে তেমনই রয়েছেন শিবু ভট্টাচার্য, অনির্বাণ চৌধুরী, অরুণময় গাঙ্গুলি, প্রসেঞ্জিৎ দে, দিলীপ মুখার্জি, বিদ্যুৎ রায়, আনোয়ার হুসেন, উৎপল সরকার, অলোক কুন্ডুর মতো খেলোয়াড়রা। ২৪ মে ডুয়ার্সের এই দল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে রওনা দিয়েছে। সেই দিন দলটিকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত থাকবেন সংস্থার সভাপতি বিশ্বরঞ্জন সরকার, নবনির্বাচিত বিধায়ক ড. সৌরভ চক্রবর্তী, জেলাশাসক, মহকুমাশাসক-সহ শহরের ক্রিকেটপ্রেমী বহু মানুষ। আলিপুরদুয়ার ভেটারেন্স ক্লাবের সম্পাদক সুব্রত গাঙ্গুলি জানিয়েছেন যে, তাঁদের ক্রিকেট টিম বিদেশ সফরে যাচ্ছে তাই খেলোয়ারদেরকে মানসিকতা, নিয়মানুবর্তিতা, ডিসিপ্লিন সমস্ত কিছুই যেন আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে খাপ খায় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করেছেন তাদের ক্রিকেট দলকে।

পরিতোষ সাহা

ডে অ্যান্ড নাইট নকআউট ক্রিকেট

বীরপাড়া উত্তরণ আয়োজিত ডে অ্যান্ড নাইট নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল লাভলি ইলেভেন এবং রানার্স শিশুবাড়ি অ্যারিয়ন। গত ২১ ও ২২ মে এই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় জুবিলি মাঠে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার ১৬টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। চ্যাম্পিয়ন টিমের হাতে তুলে দেওয়া হয় ১০ হাজার টাকা ও ট্রফি।

কৌশিক বারুই

বৃষ্টিতে ভন্ডুল ম্যাচ

বৃষ্টির কারণে একটিও ম্যাচ না খেলতে পেরে হুগলি থেকে ফিরে আসতে হল কোচবিহার জেলা সিনিয়র ক্রিকেট দলকে। সিএবি পরিচালিত আন্তঃজেলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে হুগলির চুঁচুড়ায় গিয়েছিল কোচবিহার জেলা সিনিয়র ক্রিকেট দল। সেখানে বৃষ্টির কারণে কোচবিহার দল একটিও ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। একটি মাত্র খেলায় উত্তর দিনাজপুরকে হারিয়ে বর্ধমান ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনগুলোতে বৃষ্টির জন্য বাকি দলগুলোর সঙ্গে ম্যাচ না হওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগিতে ৬ পয়েন্ট পেয়ে বর্ধমান গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলতে না পারায় স্বভাবতই হতাশ দলের প্রত্যেক ক্রিকেটার।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

উদীয়মান ফুটবলারদের নিয়ে রাইজিং ফুটবল অ্যাকাডেমি

প্রতিভাবান ফুটবলার গড়তে ওদলাবাড়ি বিধানপল্লি ময়দানে ২০০৯ সাল থেকে ফুটবল ক্যাম্প চালাচ্ছে রাইজিং ফুটবল অ্যাকাডেমি। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন অজিত বিশ্বাস ও মনোজিৎ রায়। এবারও তারা ৯ থেকে ১৬ বয়স যাদের এমন ১০০ জন কিশোরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এর মধ্যে ৮ জন কিশোরীও রয়েছে। উল্লেখ্য ২০১২ সালে রাজ্য স্তরে সুব্রত কাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ওদলাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় ফুটবল টিমের মধ্যে অধিকাংশই ছিল এই ক্যাম্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ২০১৪তে শিলিগুড়ি বিএনসি আয়োজিত অনূর্ধ্ব ১৬ ফুটবল টুর্নামেন্টে রানার্স হলেও পরের বছর রাইজিং ফুটবল অ্যাকাডেমি চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৫তে আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার জুনিয়র, সিনিয়র এবং সাব-জুনিয়র টিমে অংশ নেয় এই প্রশিক্ষণ শিবিরের ফুটবলাররা, যথাক্রমে সাব-জুনিয়রে ৪ জন, জুনিয়রে ৫ জন এবং সিনিয়রে ১ জন। ২০১৬তে অ্যাথলেটিকো ডে কলকাতা সাব জুনিয়র দলে সুযোগ পায় এই ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শুভদীপ ঘোষ।

সুধাংশু বিশ্বাস

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

‘যাত্রা হিরো টোটোন কুমার মেচেদা থেকে কোচবিহারে শো করতে এসেছিল।’ এটা পড়ার পর পটলরামকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এটা কি কোনও ইনফো? গুগল থেকে পাওয়া?’ ‘কেন? এই কথাটার মধ্যে কি ডুয়ার্সের বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকতে দেখলে না?’ পালটা বলে পটলকুমার কোথায় যেন ভ্যানিশ হয়ে গেল। কী বলল বলুন তো?

২

পাঁচ মিলে দাদা যেই জায়গা বোঝায়।
প্রথমের তিন তার অতি ধীরে যায়।
আরও এক তথ্য হেথা দিয়ে যাই।
এক-পাঁচে মিলেমিশে মিসেসের ভাই।
আরও সূত্র চাই? বেশ, তবে শুনে নিন যে ওই পাঁচ অক্ষরিয়া জায়গাটা ডুয়ার্সের পর্যটন স্পট নয় কো।

৩

‘শান’ দেওয়া বলতে ‘ধার’ দেওয়া বোঝায়। আবার ‘ধার’ দেওয়া বলতে ‘লোন’ দেওয়া বোঝায়। এখন প্রশ্ন হল এই যে, ‘মাদার লোন’ কথাটার সঙ্গে ডুয়ার্সের অপদেবতার গভীর সম্পর্ক— এটা পটলরাম পর্যটকের বাংলার টিচার একদিন নাকি বুঝিয়েছিলেন। তাই পাঠকবর্গর কাছে একান্ত রিকোয়েস্ট যে ‘মাদার লোন’ বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন উক্ত শিক্ষক? মানছি ব্যাপারটা জলের মতো সোজা, কিন্তু কেন জানি লোহার মতো কঠিন ঠেকছে!

গতবারের উত্তর— ১) লাল ঝামেলা ২) রায়কত ৩) করলা ৪) দিনহাটা

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

এক হাতে ধামসা, অন্য হাতে সাহস: ডুয়ার্সের চিত্রাঙ্গদা

আলিপুরদুয়ার শহর থেকে কিছুটা দূরে শামুকতলা নামক গঞ্জ। তার পাশেই বানিয়া গ্রাম। কাঁচা মাটির দাওয়ার উপর যিনি বসে আছেন, তাঁকে দেখে আর পাঁচজন সাধারণ মহিলার মতোই মনে হবে। কিন্তু তিনি মোটেও একজন অত্যন্ত সাধারণ মহিলা নন। শামুকতলা এলাকার গোটা সাঁওতাল পল্লির মানুষ তাঁকে এক ডাকে চেনেন— মরিয়ম, মরিয়ম সোরেন।

মরিয়মের নিজের একটা দল আছে— নাচের দল। সেটা তিনি নিজের হাতেই চালান। সাঁওতালি সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তিনি মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে যাচ্ছেন। এমন কাজ তো ডুয়ার্সে অনেকেই করছেন। কিন্তু তাঁর পরিচয় দিতে কেবল ওইটুকু বললে খুব ভুল হয়ে যায়। সবাই তাঁকে দেখলে যে মাথা নোয়ায়, তার কারণ অন্য। অসামান্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি নারী পাচারকারীদের একাই আটকে দিয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে নারী পাচারকারী দালালের ঘোরাফেরাটা ইদানীং একটু বেশিই। চটজলদি পয়সা উপার্জনের লোভে, কখনও বা বিয়ের লোভে হতদরিদ্র পরিবারের মেয়েরা এই দালালদের খপ্পরে পড়ে। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেল— এমনটা হামেশাই ঘটে। পরিবারের লোক যখন টের পায়, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে যে খুব লাভ হয়, তা-ও নয়। কারণ, একে তো ভিন রাজ্যে চলে গেলে রাজ্য পুলিশের পক্ষে কিছু করাটা চট করে কঠিন, উপরন্তু এমত অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায় যে, পাচারকারীদের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশের হিসেব থাকে। এদের হাতে কখনও সখনও অস্ত্রও থাকে। একা পাচারকারী দলের মুখোমুখি হওয়াটা তাই প্রাণের ঝুঁকিও বটে। কিন্তু মরিয়ম তা-ই

করেছিলেন। পাচারকারী দালালদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র তোয়াক্কা করেননি একেবারেই।

সালটা ২০০৩। দু'-একটি এনজিও-র সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় মরিয়ম নারী পাচার সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। গ্রামে দালাল ঢুকেছে খবর পেয়ে নিজেই চ্যালেঞ্জ করেন। বলা যায়, প্রায় একার হাতেই রুখে দেন পাচার। শুধু বিপদ নয়, জীবনহানিরও আশঙ্কা ছিল। পরোয়া করেননি ভাগ্যিস, সে যাত্রায় রক্ষে পেয়েছিল বেশ কয়েকটি কিশোরী। তাঁর এই সাহসিকতাময় কর্মের জন্য তিনি ওই বছরই ১৭ ডিসেম্বর রেড অ্যান্ড হোয়াইট ব্রেভারি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

যদিও মরিয়ম এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। তিনি মনে করেন যে, তিনি কিছুই করেননি। পাশাপাশি এটাও মনে করেন যে, কাজ রয়ে গিয়েছে বাকি, আর তা অনেকটাই। এই অঞ্চলে ইমমর‍্যাল ট্রাফিকিং বিরোধী বিবিধ আন্দোলনে তাই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। গ্রামে গ্রামে মিটিং করে বেড়ান। গ্রামের মানুষকে সচেতন করেন। সেই সংক্রান্ত দরকারি আইনগুলি গ্রামের মানুষদের জানান-বোঝান। একই সঙ্গে নাচের দলের তালিম। ধামসার তালে তালে স্টেপিং-এর প্রশিক্ষণ। বানিয়া গ্রাম এখন পরিচিত মরিয়মের গ্রাম নামে। মধ্য পঞ্চাশের এই সাঁওতাল রমণী সেখানে যেন আধুনিক চিত্রাঙ্গদা। কথায় কথায় সন্ধে নেমে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালাম। বিদায় জানানোর মুহূর্তে নির্মল হাসিতে তিনি বলে ওঠেন, 'সাবধানে যাবেন। দিনকাল ভালো না।' আরও একটু হেসে যোগ করেন, 'অবশ্য, আমি ভয় পাই না। আপনিও পাবেন না, আমি আছি।'

সুমন গোস্বামী

Celebrating the Elegance of Womanhood
Baibhavee
Yes... You are beautiful
Aangona Ladies Beauty Clinic
7 Bagha Jatin Road, Siliguri
Phone 9434034333, 9434176725
Parnika Deb, FRS 5/4, Phase-I
Kasba Industrial Estate
Kolkata 700107, Phone 9831577827
www.baibhavee.com

অ্যাসিডিটি থেকে মুক্তি !

সন্ধেবেলা পড়তে বসেছে কোয়েল। ক্লাস এইটে পড়ে। হঠাৎ পড়া ফেলে লাফিয়ে উঠে ছটফট করতে শুরু করে দিল। 'কি হয়েছে, কি হয়েছে' বলে ছটফটানি মায়েরও। কোয়েল বলল, ঝাল ঢেঁকুর মা, ঝাল ঢেঁকুর, গলা জ্বলে গেল। মায়ের বুঝতে বাকি রইলনা এ সমস্যা অ্যাসিডের। একটু বকার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, কত করে মানা করলাম সিঙাড়াটা খাস না, শুনলি না— এখন কেমন কষ্ট হচ্ছে বোঝ। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ওদেরই তো এখন খাওয়া দাওয়ার বয়স। এ সমস্যার সমাধান না হলে আর চলছে না। শুরু হল ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধপত্রের মিছিল।

সমস্যাটা এরকম

ডুয়ার্সে এ সমস্যা সর্বজনীন। ঘরে ঘরে প্রায় প্রতিটি মানুষ নাজেহাল এই বাড়তি অম্বলে। পাকস্থলীর গায়ে থাকে যে গ্যাসট্রিক গ্ল্যান্ড তারই নিঃসৃত রসে থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড(এইচ সি এল)। এই হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিডের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষরণই অ্যাসিডের কারণ। সকালে খালি পেটে দু'গ্লাস জল খেয়ে নিলে মন্দ হয় না। পাকস্থলীতে থাকা অ্যাসিডের ঘনত্ব লঘু হয়ে যায়। আর খাওয়া দাওয়ার অব্যবহিত পরেই জল না খেয়ে বরং দশ মিনিট পর খাওয়া ভাল। কারণ, খাবার স্টমাকে পৌঁছানোর পর অ্যাসিড যে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মারবে বলে তৈরি থাকে, জল খেয়ে নিলে সেগুলোকে মারার আর সুযোগ পায় না। ফলে হজমে গোলমাল দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এড়িয়ে চলুন অ্যান্টাসিড

অ্যাসিডের বাড়বাড়ন্ত যখন আর সামলানো যায় না তখন অ্যান্টাসিডের রমরমা। কিন্তু এই অ্যান্টাসিডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এত বেশি যে সেগুলোর থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। যেমন—

১। কোনও কোনও ওষুধে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়।

২। যেগুলোতে ম্যাগনেশিয়াম সল্ট থাকে সেগুলোর কারণে আবার পেট খারাপের সম্ভাবনা থাকে।

৩। নিজের খুশি মতো বাজার চলতি অ্যান্টাসিড খেয়ে নেওয়ার প্রতিক্রিয়াও কিন্তু সাংঘাতিক হতে পারে। বিশেষ করে যাদের হার্টের অসুখ কিংবা হাই প্রেসার আছে, কিংবা ব্লাড সুগার-এর শিকার তাদের কখনই উচিৎ হবে না ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টাসিড খেয়ে নেওয়া।

এবার প্রশ্ন, তাহলে অ্যাসিডের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়? উপায় আছে বৈকি।

ঘরোয়া উপায়ে দূরে ঠেলুন অ্যাসিড এবং বদহজমের উপদ্রব

১। কলা— কলা খান নিয়মিত। কলা মিউকাস নিঃসরণে সাহায্য করে। কলা পাকস্থলীর গায়ে একটি শ্লেষ্মার আবরণ তৈরি করে এমনভাবে যাতে মাত্রতিরিক্ত অ্যাসিড ক্ষরণ হয় না এবং অ্যাসিডের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেকটাই কমে যায়। কখনও কখনও অ্যাসিডের ফলে তীব্র গলা জ্বালা হয়, তখন কলা খেলে গলায় ওই আবরণ তৈরি হয়ে সাময়িক আরাম মেলে।

২। জিরা— জিরা আমাদের হজমে অত্যন্ত সহায়ক। এটি পাকস্থলীকে শান্ত রাখে। রাতের ভিজিয়ে রাখা জিরার জল সকালে খালি পেটে খেলে পেট ঠান্ডা থাকে।

৩। তুলসী— তুলসী পাতা অ্যাসিডের সমস্যায় অত্যন্ত উপকারি ওষুধ। অন্যান্য নানান ওষধির মতো এক্ষেত্রেও তুলসীর গুরুত্ব খুব বেশি। সকালে খালি পেটে ৫/৬টি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেয়ে নিন। অ্যাসিডের সমস্যা থেকে অনায়াসে মুক্তি পাবেন।

৪। আদা— আমাদের হাতের সামনে থাকা আর একটি উপকারি বস্তু হল আদা। আদার রস যেহেতু হজমের পক্ষে ভাল, তাই, অ্যাসিডের সমস্যায় আদা চিবোলে অনেকটাই উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া আদা পাকস্থলীর গায়ে মিউকাস বা শ্লেষ্মার আবরণ তৈরিতে সাহায্য করে, যার ফলে অ্যাসিডের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষরণ বাধা পায় এবং পাকস্থলী শান্ত থাকে।

৫। পুদিনা— পুদিনা পাতা আর একটি পেট শান্ত রাখার ঘরোয়া ওষুধ।

৬। এলাচ— এলাচেরও হজমে সাহায্য করার ক্ষমতা রয়েছে।

৭। লবঙ্গ— লবঙ্গও হজমের জন্য সহায়ক। খাওয়া দাওয়ার পর ২/৩টি মুখে নিয়ে চিবোলে উপকার পাওয়া যায়।

৮। আমলকি— দীর্ঘদিন অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগতে থাকলে পাকস্থলীর গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আমলকিতে ভিটামিন সি থাকায় তা পাকস্থলীর ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে।

যারা এখনও ছোট তাদের জন্য বলি, এখন থেকেই জেনে রাখো— খালি পেটে থাকবে না বেশিক্ষণ। প্রতিদিন ব্রেকফাস্টটা যেন ভাল হয়। আর অ্যাসিড যদি হয়েই যায়, অ্যান্টাসিডকে সরিয়ে রেখে যতটা সম্ভব ঘরোয়া টিপ্‌স-এই থেকো।

শ্বেতা সরখেল

আচারি বেগুন

উপকরণ- ১ চা চামচ জিরে, আধ চা চামচ কালোজিরে, আধ চা চামচ মৌরি, আধ চা চামচ সরষে। গ্রেভির জন্য— ৮-১০টি ছোট বেগুন, ২টি টম্যাটো সেদ্ধ, ২-৩টি লাল শুকনো লংকা, আধ চা চামচ সরষে, আধ চা চামচ মৌরি, ১ টেবিল চামচ আদা-রশুন পেস্ট, আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন ও প্রয়োজনমতো জল।

প্রণালী- প্রথমে টম্যাটো সেদ্ধ করে নিন। এবার আরেকটি প্যানে মাঝারি আঁচে বসান। গরম হয়ে এলে মৌরি, কালোজিরে, জিরে, সরষে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ুন। সুন্দর গন্ধ বার হলে নামিয়ে ফেলুন। ভাজা মশলাগুলো গুঁড়ো করে নিন। এবার একটি প্যানে অল্প তেল দিয়ে বেগুনগুলো দিয়ে দিন। বেগুনগুলো আস্ত রেখে মাঝখান দিয়ে চার ভাগ করে নিন। খেয়াল রাখবেন, বেগুন যেন ডাঁটার সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর মাঝের অংশ ভেঙে না যায়।

বেগুনের উপর অল্প তেল ছিটিয়ে দিন, যাতে বেগুনগুলোর দু'পাশ ভাজা হয়। এখন আরেকটি প্যানে তেল দিয়ে শুকনো লংকা ভাজুন। লংকা ভাজা হলে মৌরি, কালোজিরে, সরষে, আদা-রশুনের পেস্ট দিয়ে নাড়ুন। তারপর ভাজা গুঁড়ো মশলা, হলুদ গুঁড়ো, সেদ্ধ টম্যাটো কুচি, নুন দিয়ে রান্না করুন। মশলা থেকে তেল উপরে উঠে এলে হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ুন। অল্প জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে ১০ মিনিট রান্না করুন। এবার নামিয়ে ফেলুন মজাদার আচারি বেগুন।

রেশ ভট্টাচার্য

শখের বাগান

সহজে ফোটান হাইড্রেনজিয়া

বর্ষায় যে কোনও গাছ নিশ্চিন্তে বোনা যেতে পারে। রোজ জলসেচ দেওয়ার ঝক্কি নেই। দীর্ঘকালীন চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় এটি। সহজলভ্য অথচ বাহারি একটি ফুল পরখ করতে পারেন। নাম হাইড্রেনজিয়া। নীল, সাদা, হালকা গোলাপি রঙের বৈচিত্র আছে। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফোটে। থাকেও অনেকদিন। কারও বাগানে এই ফুলগাছ দেখলে একটা মাত্র ডাল চেয়ে আনুন। টবে লাগান বা মাটিতে, পরের বছর মে মাস নাগাদ হাইড্রেনজিয়া বাগান আলো করে ফুটবে।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super deluxe (non AC)	Rs 600	800
Deluxe AC	Rs 900	1100
Super Deluxe AC	Rs 990	1200
VIP Deluxe AC	Rs1600	1600
Suite	Rs 3000	3000
Extra PAX (Non AC)	Rs 100	-
Extra PAX (AC)	Rs 200	-

NB tax As per Applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ চোখের হাসপাতাল

ডা. ডি বি সরকার আই হসপিটাল
আর আর এন রোড, কোচবিহার
ফোন ০৩৫৮২-২২৯২২৪, ২২৩২২৪
মোবাইল ০৯৯৩২০৬৩৫০৭

এটি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা (RSBY) এবং
West Bengal Health Scheme অন্তর্ভুক্ত চোখের হাসপাতাল

রূপসী ডুয়ার্স

সাজাবো যতনে

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

কুর্চি তার মায়ের বিয়ের অ্যালবাম দেখে বলে— আমি কিন্তু তোমার মতন বিয়েতে সাজবো না। বিয়ের সাজ যেন আমাকে অপরূপা করে তোলে। মা তুমি আমার কথাটা মনে রেখ।

কথায় বলে বিয়ের লাখ কথা— এই লাখ কথার এক কথা কনের সাজসজ্জা। বর্তমান যুগে এর প্রাধান্য রয়েছে এবং বেড়েছে। আগে কনের সাজ নিয়ে এত ভাবনাচিন্তা ছিল না। সাধারণত বাড়ির পিসি, মাসি বা পাড়ার দিদি-বৌদিরাই বিয়েতে কনেকে সাজাবার দায়িত্ব নিতেন। সেই সময় বিশেষ কোনও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার হত না— মুখে স্নো, পাউডার, চোখে কাজল ব্যবহার হত। কেশ বিন্যাসে নানা ধরনের কবরি বাঁধা হত। এরপর চন্দন দিয়ে কপালে অলকাতিলকা আঁকা হত।

বর্তমান যুগে বিবাহের দিন ঠিক হতেই যেমন ভবন, ক্যাটারার বুক করতে হয়, ঠিক তেমনই মা, মাসিরা কনের সাজসজ্জা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। কনের ভূমিকাও কম যায় না। এখন সাজের ধরন পালটেছে। বিশেষজ্ঞরাও এই ব্যাপারে নানা চিন্তাভাবনা করে থাকেন।

বর্তমানে বিশেষ ধরনের ওয়াটার প্রুফ মেকআপ ব্যবহার করা হয়, এর সাহায্যে প্রসাধন করলে বহু সময় মেকআপ থাকে। চোখেও ওয়াটার প্রুফ আই লাইনার বা জেল লাইনার ব্যবহার করলে চোখের মেক ওভার করতে সুবিধে হয় এবং ধেবড়ে যায় না। নানা ধরনের আই শ্যাডো ব্যবহার করে চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। মেকআপের সাহায্যে চোখ ছোট থাকলে তা বড় দেখানো যায়। ফলস্ আই ল্যাশেস ব্যবহার করেও চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মুখের ধরন গোল, লম্বা, চওড়া থাকলে মেকআপের সাহায্যে সঠিক শেপ-এ আনা যায়। আপনার ত্বকে কোনও ধরনের দাগ থাকলে তাও মেকআপের সাহায্যে ঢাকা যায়। তবে একজন কনের সাজ ও সজ্জা নির্ভর করে তার শাড়ি গয়না ও মেকআপের উপর। বর্তমান যুগে নানা ধরনের মেকআপ হয়। তার পদ্ধতিও নানা রকম। যেমন আল্ট্রা মেকআপ, এইচডি মেকআপ এবং এয়ার ব্রাশ মেকআপ। এখন মেকআপ এমন হওয়া উচিৎ যে মেকআপ হবে কিন্তু মুখটা মুখোশের মতন মনে হবে না। মেকআপের সাহায্যে যার যা ভাল আছে তাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। কনের যা খুঁত আছে তাকে ঢাকতে হবে। মেকআপ আপনাকে অপরূপা অবশ্যই করতে পারে। এর জন্য চাই এক বিশেষজ্ঞা বা বিশেষজ্ঞ। মেকআপের অনেক আগে থেকে কনের ত্বক, চুল এব হাত-পায়ের যত্ন নেওয়া উচিৎ। তবে মেকআপ করতে সুবিধে হবে।

মেকআপের নানা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আপনি হয়ে উঠুন স্বপ্নের পরী ও রাজকন্যা।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

ডুয়ার্সে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কত গল্প, কতরকম মানুষ, কত ঘটনা। তখনও বন কেটে সেই অর্থে বসত গড়ে ওঠেনি। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছিল ক'জন বন্ধু। নানা জায়গা ঘুরে বেড়ানো তাদের নেশা। ডুয়ার্স বলতে তখন সাপ, ব্যাং, হাতি, বাঘবন, জঙ্গল, মশা-মাছি, আর কিছু শ্যাওলা ধরা মানুষ— এই ছিল তাদের পরোক্ষ ধারণা। অবশ্য আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগের কথা। আসাম লিঙ্ক এক্সপ্রেসে শিলিগুড়ি জংশন ছুঁয়ে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত আসতে আসতে হিমালয়ের চেহারাটা কিছুটা নজরে এসেছিল। চা-বাগান, ঝরনা, পাহাড়, বনের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মুগ্ধতা জমিয়ে বসেছিল। লোকবসতি তখন কম। গোটাকয়েক বাড়ি, টিম্বার মার্চেন্টদের শালের তক্তা পেটানো আস্তানা, গোটাকয়েক ঝাঁপ ফেলা দোকান ছাড়া বাদবাকি শাল সেগুনের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। রেল স্টেশন জঙ্গলের ধার ঘেঁষে। সেদিন সন্ধেতে আলিপুরদুয়ার জংশনে নেমে তাদের বড্ড শীত করছিল। তখন মে মাস। কলকাতা হিসেব মতোই চলছিল। নিয়ম মেনে পাখাটাখা চলছে। কিন্তু ডুয়ার্সের ক্যালেন্ডার আলাদা।

দুপুরে বৃষ্টি হয়েছে। ভেজা শালবনের মধ্য দিয়ে আসা ভেজা বাতাসে শীতে বাবুরা কাবু হয়ে পড়লেন। গরম জামা কাপড় সঙ্গে নেই। তাড়াতাড়ি শুতে পারলে বাঁচেন, এমন অবস্থা। পরদিন বাড়িশুদ্ধ লোক হেসে গড়াগড়ি। তিনজন কলকাতার বাবু বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে কাঁপছেন— দিদি, একটু আদা চা হবে?

ডুয়ার্স ঘুরতে এসে অবশ্য তিন দিনের জায়গায় সাত দিন হয়ে গেল। সেবক, মংপং, বক্সা, জয়ন্তি ছাড়া অনেক জায়গার আবিষ্কার পর্ব চলছে তাদের। সাত দিনেই চেহারায় চিকন সবুজের ছায়া পড়েছে যেন! এক শেষ বিকেলে তারা ব্যাগ গুছোতে শুরু করল। একজন গুছানো রেখে ধ্যাত বলে বসে পড়ল— ইচ্ছে করছে না ফিরে যেতে। তোমাদের? এমন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বাকিরা থমকে গেল। সত্যি চলে যাচ্ছে নাকি? কিছুই যে দেখা হল না! তাতে কী? আবার আসতে হবে! আমন্ত্রণের দরজা চিরকালই খুলে ডুয়ার্স।

রাতে গল্পের ঝুলি খুলেছে ডুয়ার্সের মানুষ। যে বাড়িতে ওরা এসেছে, সেই বাড়ির গিন্নি জিগ্যেস করেছে— বাঘ

দেখেছেন কখনও?

গিন্নি হেসে সারা। এ যেন কোনও ধর্মনিষ্ঠ মানুষকে জিগ্যেস করা হচ্ছে তোমার ধর্মগ্রন্থের নাম জান? বাঘ শব্দ তখন পড়শি শব্দের সমার্থক। বাঘ দেখা বিশেষ কোনও ঘটনা ছিল না। বাড়ির সামনে জঙ্গল। বৃষ্টির জল জমে থাকায় চকচক করছে। গিন্নি ভেবেছেন বাঘ। মানে, বাঘ হতেই পারে! দেখা যায় তো! তবে একদিন সন্ধেবেলায় যা কান্ড হয়েছিল! সে সময় ডুয়ার্সে পাকাবাড়ি তৈরি হত না। এর দুটো কারণ। এক, আর্থসামাজিক দুই, ভূমিকম্প। কাঠের বাড়ি, মোটা মোটা খুঁটির উপর দাঁড়ানো বাড়ি। কাঠের দোতলা বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন গিন্নি। কর্তাটি গিয়েছেন সান্ধ্য আড্ডায়। গিন্নি বসে থাকতে থাকতে দেখলেন বাড়ির সামনের ঝোপঝাড় জঙ্গল যেন নড়ছে। কয়েকদিন আগেই গোয়াল থেকে একটা বাছুরকে টেনে নিয়ে গিয়েছে বাঘ। বাছুরের অর্ধভুক্ত দেহাবশেষ পড়েছিল নালার পাশে। বাঘ ফের যে আসবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে? গিন্নি নিবিষ্ট চোখে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, বাঘই। বন্দুকটা হাতে রাখা ভাল। পরিস্থিতির চাপে কর্তা গিন্নিকে বন্দুকের সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। কর্তার মতো গিন্নিরও লাইসেন্স ছিল। গিন্নি সাহস পেলেন না। বলা যায় না, বাঘ লাফিয়ে চলে আসতে পারে কৃতজ্ঞতা জানাতে— আপনার গোয়ালের ডিনার হেব্বি টেস্টি ছিল ম্যাম!

নির্জন পরিবেশ। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। ঝাপসা কালো, ঝাপসা আলো মিলে মিশে অদ্ভুত পরিবেশ! জঙ্গলের মধ্যে প্রাণীটি নড়াচড়া করছে না। ঠিক এই সময় ঝোপ নড়ে উঠল। গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তাক করেছেন। ট্রিগারে আঙুল। তখন সেই বাঘ হুবহু মানুষের গলায় চেঁচিয়ে উঠল— মাইজি, মত মারিয়ে। ম্যায় লছমিচাঁন্দ হু! ইঁহাপে টাট্টি করনে আয়া। গিন্নির মাথায় হাত! কাটা কাপড়ের দোকানি লছমিচাঁন্দ প্রাতঃ ও সান্ধ্য কৃত্য সারতে আসে এখানে। ওকে দেখে বাঘ ভেবেছেন গিন্নি!

কলকাতার বাবুরা গেলেন চলে, তবে বুড়ো বয়স পর্যন্ত আসতেন ডুয়ার্সে। আসলে একটা মোহ আছে ডুয়ার্সের। বশীকরণ মন্ত্র জানে সে। একবার যে এসেছে, সহজে ছাড়া পাবে নাকি? অজগর যেভাবে দৃষ্টিতে আবদ্ধ করে রাখে, ঠিক সেভাবে সম্মোহিত করে ডুয়ার্স। এভাবেই আটকে গেলেন অনেক মানুষ। তাঁরা কোথা থেকে এসেছিলেন সে কথা নিজেরাই ভুলে গিয়েছেন। এই সূত্রে মনে পড়ল সুশীলবাবুকে।

চারপাশে চা-বাগান। মাঝখানে ছোট্ট জনপদ বীরপাড়া।

রেল স্টেশনের নাম দলগাঁও। সে সময় তো টিভি বা বিনোদনের কিছু ছিল না। একটা সিনেমা হল আছে। ওঁম সিনেমা। মালিক ছিলেন অর্ধেন্দুবাবু। ছ'মাসে ন'মাসে বাংলা ছবি এলে আশপাশের চা-বাগানগুলোতে হইহই পড়ে যেত। হিন্দি সিনেমা চলত রমরম করে। শীতকালে যাত্রা থিয়েটার হত। সেখানেও সেই সাড়া পাওয়া যেত। এক শীতের গল্প। সেবারে সার্কাস এল বীরপাড়ায়। চন্দ্রলেখা সার্কাস। খুব ছোট নয়। আবার বিশাল বড়ও নয়। সার্কাসের ম্যানেজার ছিলেন সুশীলবাবু। সার্কাস মানেই বিরাট সংসার। মানুষ ও পশুপাখি মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার। সুশীলবাবু সব সামলাচ্ছিলেন। নানা জায়গা ঘুরে সার্কাস এল ডুয়ার্সে। জনজীবনে হিল্লোল বয়ে গেল। কেবল সার্কাস দেখতে যাওয়াই তো নয়, দিনরাত সার্কাস নিয়ে আলোচনাও কম নাকি? বাড়ির উঠোনে ছোটদের সার্কাস শুরু হল। যেভাবে পর্দা সরিয়ে খেলোয়াড়েরা দৌড়ে আসে, যেভাবে হাত তুলে অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়ায়, হুবহু নকল হতে থাকে। মুখে বাজনা ট্যা রা রা রা ঝিন! বড়দের কাজ অন্য। তাঁরা সার্কাসের মানুষদের সঙ্গে মিশে অন্দরমহলের খবর জোগাড় করতে লাগল। জমজমিয়ে চলছে সার্কাস, একসময় তাঁবু গোটানোর সময় হল। কিন্তু, পরিস্থিতি এবারে একেবারেই অন্যরকম। যে ম্যানেজারবাবু সব ম্যানেজ করছিলেন, সব সামলে চলছিলেন, এখন তাঁকে সামলায় কে? বশীকরণ মন্ত্র লেগেছে বুকে। হার্টের অলিন্দ- নিলয় সর্বত্র সেই বশীকরণের সুর। তাঁবু গোটানো চলছে। ম্যানেজারবাবু ডিসিশন নিয়ে ফেলেছেন। নাহ্, এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া? তা-ও কি হয়? পাইথনের প্রবল আলিঙ্গনকে অস্বীকার করার সত্যি কোনও রাস্তা নেই!

ট্রাকগুলো চলে যাচ্ছে মালবোঝাই হয়ে। রয়ে গেলেন সুশীলবাবু। বীরপাড়াতে। ডুয়ার্সে।

সাগরিকা রায়

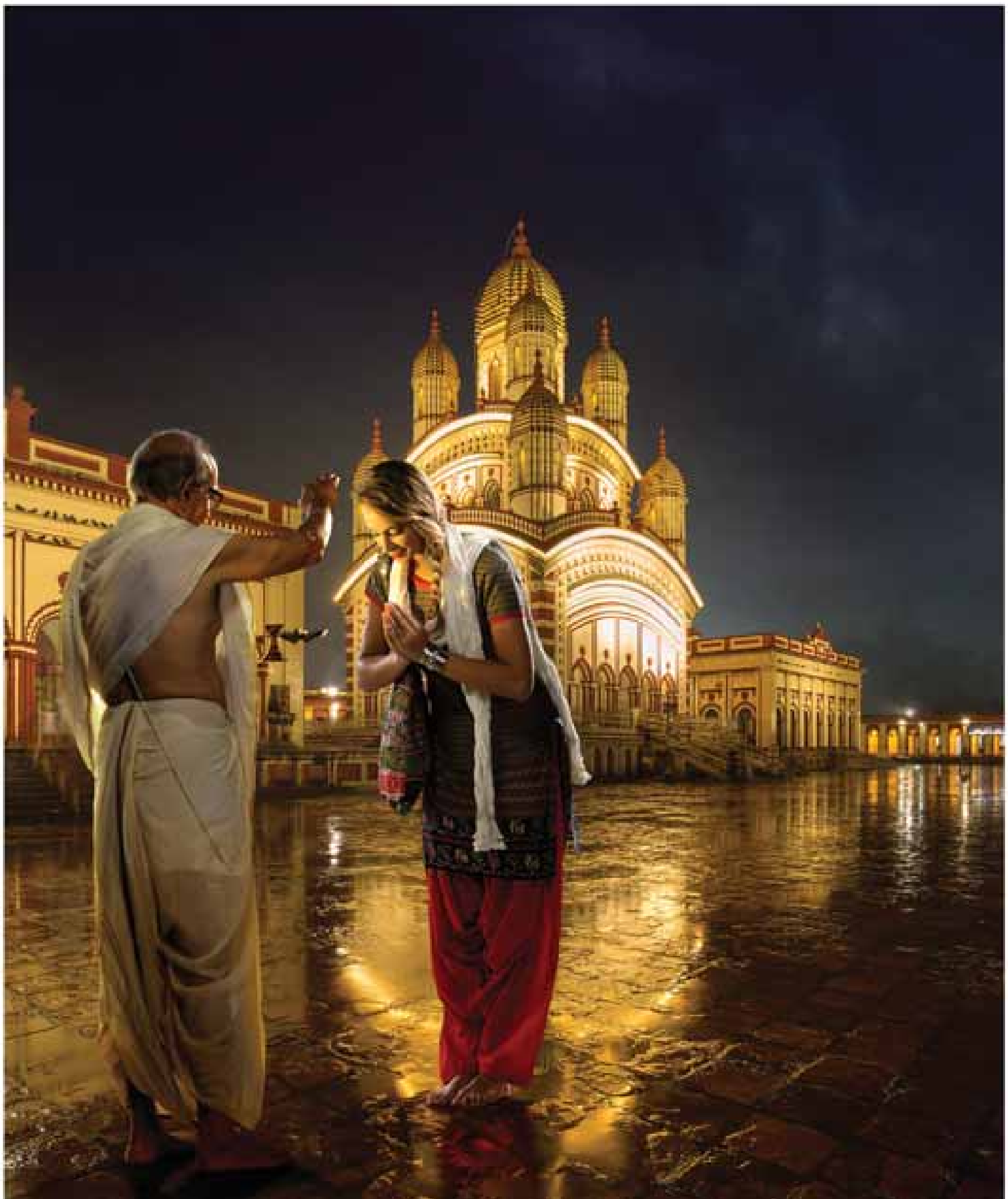

বিশ্বাস থাক এ শহরে (দক্ষিণেশ্বর) শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচীন দক্ষিণেশ্বর থেকে পঞ্চবটীর অন্ধকার — আধ্যাত্মবাদ এ শহরের মনে প্রাণে। এ শহরে আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস দেব-দেবী, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে। যা বিশ্বাসে অবিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসে বিশ্বাস করাতে শেখায় অবলীলায়।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb www.twitter.com/TourismBengal (033)2243 6440, 2248 8271

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-3 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

রংরুট ও এখন ডুয়ার্সের বই

এখন ডুয়ার্স-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন

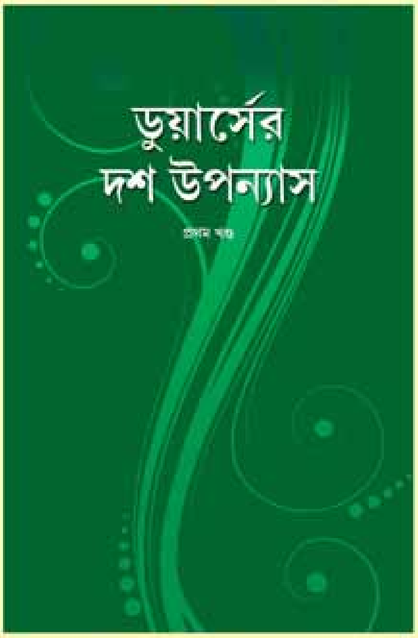

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা।

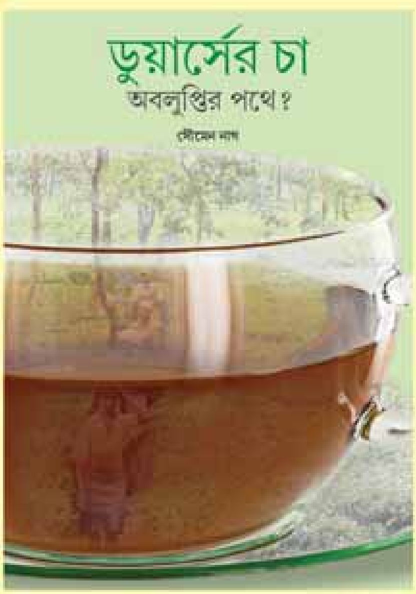

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ মূল্য ১৫০ টাকা।

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য ২০০ টাকা

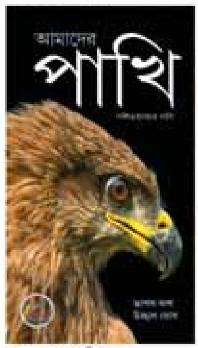

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য ১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা

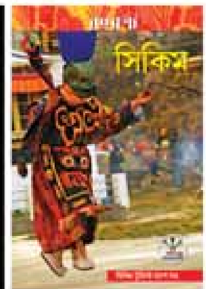

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ।
মূল্য ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও অলিম্পিক পাহাড়ের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

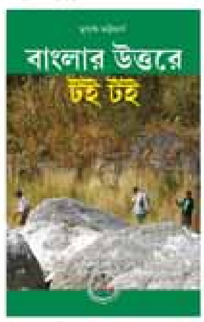

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ১০০ টাকা।

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য ১৫০ টাকা

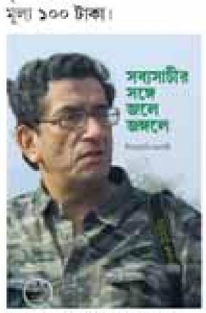

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য ১৫০ টাকা

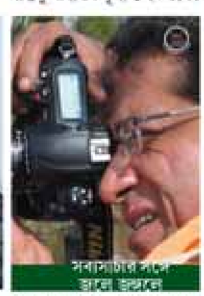

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য ১০০ টাকা

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.